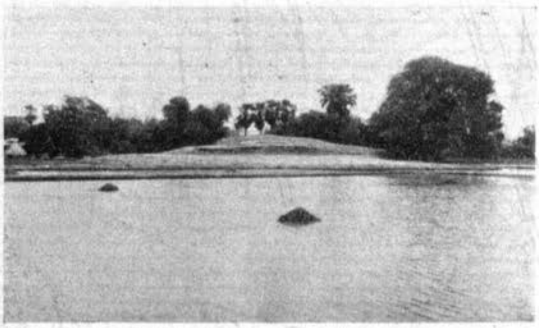
মেলাস্থান একটি নগরের আকার ধারণ করে। মেলার সময় আক্কেলপুর স্টেশন হইতে গোপীনাথপুর পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ী ও টমটম যাতায়াত করে।

গোপীনাথপুরের নিকটেই **মাটিহাস** গ্রাম। এই স্থানে বিস্তৃত একটি ধ্বংসাবশেষ আছে।

আক্কেলপুর স্টেশন হইতে প্রায় ১০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে **ক্ষেতলাল** গ্রাম অবস্থিত। এখানে একটি থানা আছে। থানার দক্ষিণে রাজবাড়ীর চড়া নামে একটি রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে; ইহার পূর্ব্বধারে মহলপুকুর এবং নিকটে সনকা ও মেনকা নামে দুটি জলাশয় আছে। প্রবাদ এই রাজবাড়ী রাজা অনন্তরাম রায়ের। এই গ্রাম হইতে প্রাপ্ত একটি বোধিসত্ত্ব লোকনাথের, একটি মহিষাসনে উপবিষ্ট যমের ও দুইটি জননী ও শিশুর মূর্ত্তি রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।



মাটিহাস স্তূপ

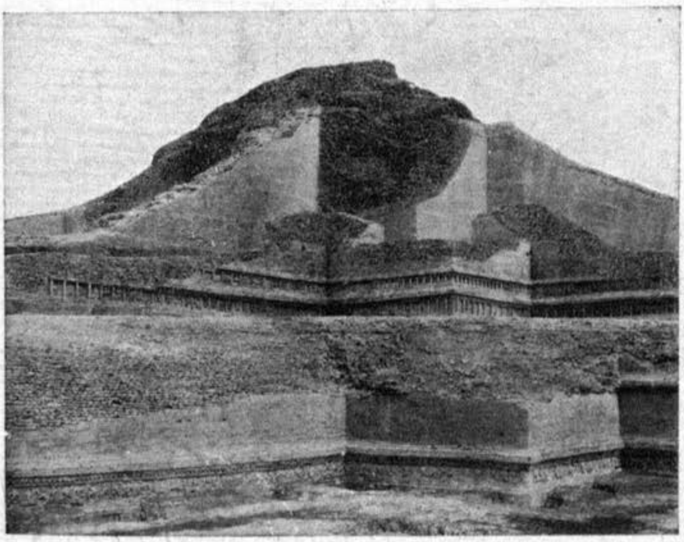
**জামালগঞ্জ**—কলিকাতা হইতে ১৯০ মাইল দূর। ইহা বগুড়া জেলার একটি বৃহৎ পাটের গঞ্জ।

**পাহাড়পুর**—জামালগঞ্জ হইতে তিন মাইল পশ্চিমে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত প্রাচীন বাংলার অতীত গৌরবের প্রধান নিদর্শন পাহাড়পুর গ্রাম অবস্থিত। স্টেশন হইতে লোকাল বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে; গরুর গাড়ীতে কিংবা পদব্রজে যাইতে হয়। কয়েক বৎসর হইল ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্ব্ব চক্রের অধ্যক্ষ এখানে ৮০ ফুট উচ্চ প্রকাণ্ড একটি ইষ্টকময় স্তূপ খনন করিয়া একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মায়তনের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। পাহাড়পুর নামটি কিন্তু আধুনিক। খনন করিবার পূর্ব্বে এখানকার বিরাট জঙ্গলাকীর্ণ স্তূপটি পাহাড়ের মত দেখাইত বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে পাহাড়পুর। এই স্থানের প্রাচীন নাম ছিল সোমপুর। এখানকার ভগ্নাবশেষের মধ্যে যে একটি মুদ্রা (Seal) পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লেখা রহিয়াছে—"সোমপুর ধর্ম্মশালা বিহার" পাহাড়পুরের পার্শ্ববর্ত্তী একটি গ্রাম এখনও "ওম্পুর" নামে পরিচিত। মহাস্থানগড় বা প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বাণগড় বা প্রাচীন কোটিবর্ষ হইতে যথাক্রমে উত্তর পশ্চিমে ও দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রায় ৩০ মাইল দূরে এই বিরাট বিহার ও সঙ্ঘারাম

9a

অবস্থিত। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, নগরীর কোলাহল হইতে বহুদূরে শান্তি ও নির্জ্জনতার মধ্যে ভিক্ষুগণ যাহাতে ধর্ম্মসাধনায় মগ্ন থাকিতে পারেন সেইজন্য সম্ভবতঃ এই স্থানে এই মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পাহাড়পুরের প্রধান স্তূপের মন্দির বা মহাবিহারটির গঠনরীতি স্বতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে ইহা এক নূতন নিদর্শন। ভারতে এইরূপ পদ্ধতি অন্যস্থানে অনুসৃত না হইলেও ব্রহ্মে, কম্বোজে ও যবদ্বীপের বিরাট মন্দিরগুলিতে যে পাহাড়পুরের আদর্শই গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। যবদ্বীপের বরবদুর ও প্রাম্বাণম ও কম্বোজের আঙ্কোরভাট প্রভৃতি জগৎ-প্রসিদ্ধ মন্দির-গুলির গঠন রীতির সহিত পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারের গঠনরীতির সৌসাদৃশ্য হইতে প্রমাণ হয় যে, পূর্ব্ব এসিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারে বাংলার দান অসামান্য। প্রথম পাল রাজত্বের যুগে যবদ্বীপ প্রভৃতির সহিত পূর্ব্বভারতের ঘনিষ্ঠতার কথা নালান্দায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।



পাহাড়পুর স্তূপের দৃশ্য

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পাহাড়পুরের মহাবিহার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ঐ স্থানে বা নিকটে চতুর্ম্মুখ জৈনমন্দির ছিল এবং কতকাংশে তাহার আদর্শে বিহারটি পরে নির্ম্মিত হয়; পাহাড়পুরের সহিত জৈনদের যে সম্বন্ধ ছিল তাহার প্রমাণ এই স্তূপ খননকালে ভাল ভাবেই পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক চতুর্ম্মুখ জৈনমন্দিরের সহিত বিহারটির প্রাথমিক আকৃতিগত ও কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও বিহারের তিনটি তল, প্রতি তলে প্রদক্ষিণের পথ প্রভৃতি নানা বিষয়ে ইহার মৌলিকত্ব ও বিশেষত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রধান মন্দির বা বিহারটি ঘিরিয়া পাহাড়পুরের বিরাট সমচতুর্ভুর্জ সঙ্ঘারামটি অবস্থিত; ইহার প্রতিটি ভুজ বাহিরে ৮২২ ফুট লম্বা। বৌদ্ধভিক্ষুদের এত বড় সঙ্ঘারাম ভারতে আর কোথাও নির্ম্মিত হয় নাই। ইহাতে সারিসারি চারিটি ভুজে ১৮৯ কুঠরী ও প্রবেশমুখে একটি বড় দালান আছে; কুঠরীগুলির সম্মুখে ৮।৯ ফুট লম্বা একটি বারান্দা ঘুরিয়া গিয়াছে। এই কুঠরীগুলির মধ্যে ৯২টিতে উচ্চ পূজার বেদী দৃষ্ট হয়; একটি মহাবিহারের নিকট সঙ্ঘারাম মধ্যে এতগুলি পৃথক পূজার স্থান থাকিবার কি উদ্দেশ্য ছিল তাহা নিরূপিত হয় নাই।



পাহাড়পুর স্তূপের কারুকার্য্য (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

সঙ্ঘারামের পূর্ব্বদিকে এবং ইহার বাহির প্রাচীর হইতে প্রায় ১০০ ফুট দূরে সত্যপীরের ভিটা নামক ক্ষুদ্র স্তূপ খনন করিয়া তারার মন্দির পাওয়া গিয়াছে। ইহার সহিত দূরবর্ত্তী কালে একটি গ্রাম্য কাহিনী যুক্ত হওয়ার ইহার সত্যপীরের ভিটা নাম হইয়াছে। কথিত আছে, এই স্থানের রাজা মহীদলনের কন্যা সন্ধ্যাবতীর পুত্র সত্যপীর একজন বিশিষ্ট ধার্ম্মিক ও সাধু বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং একটি ভীষণ বন্যায় ইনি ভাসিয়া গিয়াছিলেন। সঙ্ঘারামের বাহিরের প্রাচীর হইতে ১৬০ ফুট দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি প্রাচীন স্নানের ঘাট আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রাম্যকাহিনী অনুসারে রাজকন্যা সন্ধ্যাবতী এই ঘাটে প্রত্যহ স্নান করিতেন।

পাহাড়পুরে পালযুগের পূর্ব্বেকার নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া গেলেও ইহার মহা-বিহার সঙ্ঘারাম প্রভৃতি পালযুগে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত।

পাহাড়পুরের মহাবিহারের পাদমূলে চারিদিকে প্রস্তর গাত্রে উৎকীর্ণ যে ৬৩টি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সত্যই অপূর্ব্ব; পূর্ব্বভারতে ইহার তুলনা মিলেনা। পালযুগের বিস্ময়কর ভাস্কর্য্য শিল্পের সূত্রপাত এইগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পালযুগের প্রসিদ্ধ ভাস্কর ধীমান ও বীটপাল ইহার পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক।

পাহাড়পুরে কয়েকটি খোদিত প্রস্তর স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে; ইহার মধ্যে একটি রাজা মহেন্দ্র পালের রাজ্যকালের।



পাহাড়পুর স্তূপের কারুকার্য্য (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

তিব্বতীয় সাহিত্য হইতে জানা যায়, খৃষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সোমপুর মহাবিহার তিব্বতীয়গণের একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থান ছিল। শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর অতীশের তিব্বতীয় জীবনচরিত হইতে জানা যায় যে, তিনি বহু বৎসর সোমপুর বিহারে বাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার গুরু ছিলেন এই বিহারের মহাস্থবির রত্নাকর-শান্তি। নালান্দা ও বোধগয়ায় প্রাপ্ত খোদিত লিপি হইতে তথায় এই সোমপুর বিহারের কয়েকজন ভিক্ষুর দানের কথা জানিতে পারা যায়।

পুরাকালে একটি নদী এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত। আজও অধুনালুপ্ত এই নদীর পার্শ্বস্থিত ঘাট ও তৎসংলগ্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর পশ্চিমতীরে চারিদিকে উচ্চ দেওয়ালবিশিষ্ট গড়ের মধ্যস্থলে মূল অধিষ্ঠানটি অবস্থিত। উত্তরদিকস্থ দেওয়ালের মধ্যস্থলে প্রধান প্রবেশদ্বার আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই

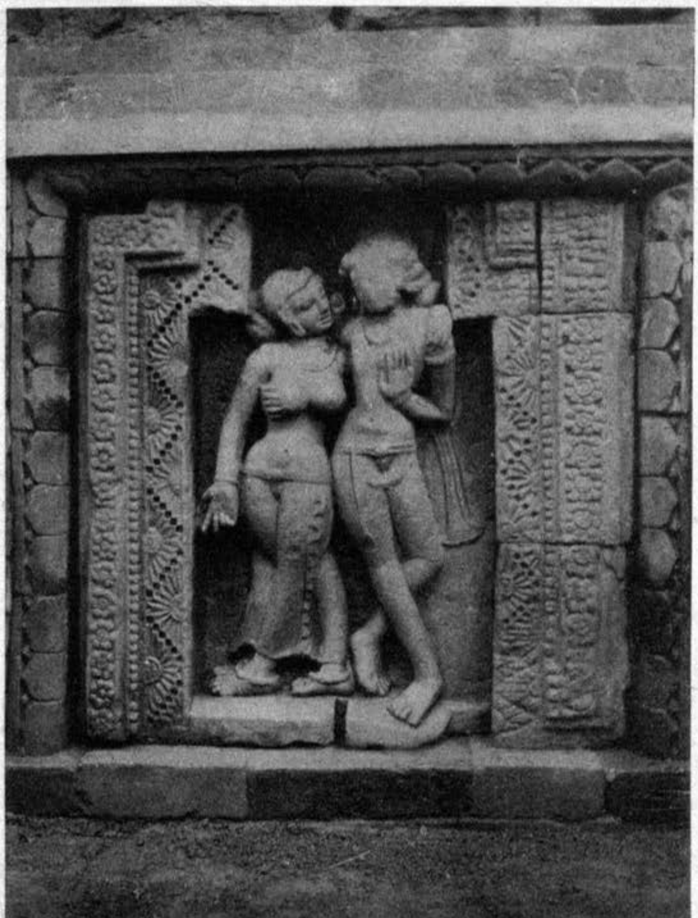
প্রবেশপথের ঠিক সম্মুখভাগে গড়ের মধ্যস্থিত প্রধান অধিষ্ঠানের সুবৃহৎ সিঁড়ি অবস্থিত। উক্ত সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতে হয়। এই তলে একটি "প্রদক্ষিণ-পথ" আছে। পথের চারিধারে নক্সা করা টালিতে (Plaques) মানুষ, নানারকম জীবজন্তুর ছবি এবং "পঞ্চতন্ত্র" ও "হিতোপদেশে" বর্ণিত গল্প চিত্রিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে "বানর-কীলক-



ধেনুকাসুরবধ, পাহাড়পুর স্তূপ [প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]

কথা" ও "সিংহ-শশক-কথা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার কিঞ্চিৎ উপরিভাগে একটি থামে যে শিলালেখন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে কনৌজের গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশের রাজা মহেন্দ্রপাল দেবের সময়ে এই মন্দিরের কিয়দংশের সংস্কার হইয়াছিল। পাহাড়পুরের আবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে যে ১৫৯ গৌপ্তাব্দে অর্থাৎ গুপ্তবংশীয় সম্রাট বুধগুপ্তের সময়ে এই স্থানে একটি জৈন মন্দির ছিল। পাহাড়-পুরের মন্দিরের ভিত্তি খুঁড়িবার সময় বহু পাথরের হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে

তন্মধ্যে "গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ" শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক "ধেনুকাসুর" ও "চানুর মুষ্টিক বধ" প্রভৃতি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মূর্ত্তি সত্যই চিত্তাকর্ষক। তদ্ভিন্ন রামায়ণে বর্ণিত "বালীবধ," বালী সুগ্রীব সংগ্রাম, মহাভারতে বর্ণিত "সুভদ্রা হরণ" ও "মহাদেবের হলাহল পান"



রাধাকৃষ্ণ, পাহাড়পুর স্তূপ

বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির চিত্র মন্দিরের প্রাচীর ও পাদমূলে শোভা পাইতেছে। এই স্থানে বিহারগাত্রে রাধাকৃষ্ণের যে অনুপম মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছে উহাই প্রাচীনতম যুগলমূর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়।

হিন্দুশাস্ত্রের মতে গৃহ ও মন্দির প্রভৃতির প্রবেশ দ্বার উত্তর-মুখী হওয়া শুভ এবং প্রশস্ত। পাহাড়পুরের মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারও উত্তরমুখী দেখা যায়। এখানে একটি

বিষয়ে বিশেষভাবে প্রত্যেক বাঙালী পর্য্যটকের এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য যে, এখানকার মন্দির-গাত্রে দগ্ধ মৃত্তিকা নিৰ্ম্মিত (terracotta) যে সমুদয় জীবজন্তুর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—মৎস্য, শুশুক, কুম্ভীর, বিবিধ সরীসৃপ, শঙ্খ, ঝিনুক প্রভৃতি তাহাদের প্রায় সমস্তই বাংলা দেশের এবং বাঙালীর চির-পরিচিত। এই সকল হইতে প্রমাণিত হয় যে, পাহাড়পুরের বিহারাদি বাঙালী স্থপতি ও ভাস্করের কীর্ত্তি।



বেলআমলা গ্রামে প্রাপ্ত বাসুদেব মূর্ত্তি, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত [ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে ]

**জয়পুর হাট**—কলিকাতা হইতে ১৯৫ মাইল দূর। স্টেশন হইতে দেড় মাইল পশ্চিমে **বেলআমলা** গ্রামে রাজীবলোচন মণ্ডল নামে একজন অগাধ ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ধনী জগৎশেঠের সমান বিত্তশালী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার বংশীয়গণের নিকট এককোটি

টাকার একখানি প্রাচীন ডিক্রী এখনও রক্ষিত আছে। রাজীবলোচন প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ শিব মন্দির এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের ইট গুলিতে ১, ২, ৩ বা ১পদ্ম, ১ঘট, ১ তরবারি ইত্যাদি চিহ্নিত আছে; মন্দির নির্ম্মাণের সময়ে এই সকল চিহ্নের সাহায্যে অনভিজ্ঞ মজুর বিশেষ বিশেষ স্থানের ইট সহজেই স্থপতির নিকট পৌছাইয়া দিত। বেলআমলায় প্রাপ্ত একটি চণ্ডীমূর্ত্তি, একটি সূর্য্যমূর্ত্তি, একটি সুন্দর বাসুদেবমূর্ত্তি ও একটি বুদ্ধমূর্ত্তি-খোদিত চতুষ্কোণ পাথর রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। চণ্ডীমূর্ত্তির তলায় লেখা আছে "রাজ্ঞীশ্রীগীতা ললিতা।"

দিনাজপুর জেলার করতোয়া হইতে উৎপন্ন যমুনা নামে একটি মাঝারি নদী বগুড়া জেলার বেলআমলার কিছু দক্ষিণে আসিয়া দুই ভাগ হইয়াছে। পশ্চিম শাখাটি যমুনা নামেই দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্ব শাখাটি "কাটাযমুনা" নামে ৯ মাইল বহিয়া আক্কেলপুরের নিকট তুলসী গঙ্গা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কথিত আছে এই শাখাটি বেলআমলার রাজীবলোচন মণ্ডল মহাশয় কাটাইয়া দিয়াছিলেন।

বেলআমলার নিকটেই খঞ্জনপুর গ্রামে খাসমহালের দপ্তর অবস্থিত।

বেলআমলার অনতিদূরে বগুড়ার সীমান্তে জয়পুর হাট স্টেশন হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত পত্নীতলা থানার **মুকুন্দপুর** গ্রামে ক্ষৌণী-নায়ক ভীমের স্মৃতি বিজড়িত (সান্তাহার দ্রষ্টব্য) হরগৌরী মণ্ডপ ও "ভীমের পান্টী" নামে পরিচিত প্রাচীন গরুড় স্তম্ভ বা বাদাল স্তম্ভ বিদ্যমান। হরগৌরী মণ্ডপটি অতি পুরাতন ইট পাথর দিয়া তৈয়ারী একটি উঁচু ঢিবি এবং ইহা মঙ্গলবাড়ী হাটের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। এই ঢিবির উপর চারিটি মন্দির আছে। মন্দিরগুলির মধ্যে হরগৌরী, সিংহবাহিনী, জয়দুর্গার প্রস্তর মূর্ত্তি ও শিবের মুখাঙ্কিত শিবলিঙ্গ আছেন। হরগৌরী মন্দিরের নিকট "অমৃত কুণ্ড" ও "কোদাল ধোয়া" নামে দুইটি পুকুর আছে। কালক্রমে মহারাজ ভীমের কীর্ত্তি কলাপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বীরেশ্বর ব্রহ্মচারী নামক একজন সন্ন্যাসী ভগ্নস্তূপ হইতে দেবমূর্ত্তি গুলির উদ্ধার সাধন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

গরুড়স্তম্ভ বা বাদালস্তম্ভ হরগৌরী মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার কতকাংশ বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট অংশে সুপ্রসিদ্ধ পালরাজগণের মন্ত্রী বংশের প্রশস্তি আটাশটি সংস্কৃত শ্লোকে উৎকীর্ণ আছে। প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে নারায়ণ পালের রাজত্ব কালে মন্ত্রী ভট্টগুরব মিশ্র এই স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠা করেন; এই স্থান ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বংশের যজ্ঞভূমি ছিল এবং পালরাজগণ এই স্থানে আসিয়া শান্তিজল লইতেন। গুরব মিশ্রের স্তম্ভ-লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে মহারাজ ধর্ম্মপালের পুত্র মহারাজ দেবপাল বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে দেবপাল মন্ত্রী কেদার মিশ্রের সাহায্যে ওড়িয়া ও হূনদের দমন ও গুর্জ্জরনাথ ও দ্রবিড়েশ্বরের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত গুর্জ্জর রাজ্যের দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমায় ও দ্রবিড় বা রাষ্ট্রকূট রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন

বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোনও উপত্যকায় রাষ্ট্রকূট বংশীয় অমোঘবর্ষ ও গুর্জ্জরনাথ নাগভট-পুত্র রামভদ্রদেব দেবপালের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন। মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে মহারাজ দেবপালের রাজ্য হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নালান্দার ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত মহারাজ দেবপালদেবের রাজ্যের ৩৮ বৎসরে সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে নবদ্বীপের অধিপতি বালপুত্রদেব নালান্দা তীর্থে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং নালান্দা পালবংশীয় দেবপালদেবের রাজ্যভুক্ত থাকায় তাঁহার নিকট একজন দূত পাঠাইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত বিহারের বুদ্ধমূর্ত্তি পূজা এবং ভিক্ষুগণের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পাঁচ খানি গ্রাম দান করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ অনুযায়ী দেবপালদেব পাঁচখানি গ্রাম বৌদ্ধ বিহারে দান করিয়াছিলেন। দেবপালদেব আফগানিস্থানের অন্তর্গত নগরহার, (বর্ত্তমান নিংবাহারের) অধিবাসী ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র মহাপণ্ডিত বীরদেবকে নালান্দা মহাবিহারের সঙ্ঘ-স্থবির নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দেবপালদেব ৮২০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল বংশীয় কেহ উত্তরাধিকারী না থাকায় প্রথম গোপালদেবের দ্বিতীয় পুত্র বাক্‌পালের পৌত্র বিগ্রহপাল বা শূরপাল গৌড়-বঙ্গ-মগধের অধীশ্বর হন। বিগ্রহপাল হৈহয় অর্থাৎ চেদী বা কলচুরি রাজবংশের লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভট্টগুরব মিশ্রের পিতা কেদার মিশ্র তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের তৃতীয়বর্ষে সিন্ধুদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু পূর্ণদাস পাটনা জেলার বিহার নগরে দুইটি বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন; এই মূর্ত্তির পাদপীঠে বিগ্রহপালের শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নারায়ণপাল গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি ৫০ বৎসরেরও অধিককাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই রাজত্বকালে রাজ্যের অনেকাংশ পালবংশের হস্তচ্যুত হয়। ধর্ম্মপাল ও দেবপালদেবের সময়ে গৌড়-মগধ-বঙ্গে শিল্পোন্নতি চরম সীমায় পৌছিয়াছিল। গৌড় ও মগধ প্রস্তর শিল্পে সারা ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নানাপ্রকার প্রস্তর ও ধাতু নির্ম্মিত বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্ত্তি এই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নারায়ণপালের পর পালরাজ বংশের অধঃপতনের সহিত গৌড়ীয় শিল্পের অবনতি ঘটে।

গরুড় স্তম্ভ হইতে ৩ মাইল দূরে চিরী বা শ্রী নদীর ধারে প্রায় ১,০০০ ফুট পরিধি লইয়া বৃত্তাকারের একটি স্তূপ আছে। নিকটেই ২২৫ ফুট লম্বা আর একটি ধ্বংসস্তূপ এবং একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন জলাশয় আছে। অষ্টকোণ-বিশিষ্ট একটি প্রস্তর স্তম্ভও এখানে পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানেই "রামচরিত" বর্ণিত পালরাজগণের সময়কার প্রসিদ্ধ জগদ্দল নামক মহাবিহার বা বৌদ্ধ বিশ্ব-বিদ্যালয় অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

গরুড়স্তম্ভের দক্ষিণে **দেওয়ানবাড়ী** ও **ধুরইল** নামক সমীপবর্ত্তী গ্রামেও বহু পুরাতন সরোবর ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে।

মুকুন্দপুরের হরগৌরী মন্দিরের কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত **সিদ্ধিপুর** গ্রামে ভীমসাগর নামক একটি দীঘি, ভীমের চামুণ্ডা মণ্ডপ ও জাঙ্গাল আছে। এইগুলির সহিত ক্ষৌণী-নায়ক ভীমের স্মৃতি-বিজড়িত।

জয়পুরহাট স্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে **তেঘরিয়া** গ্রাম। তেঘরিয়ার মাঠের মধ্যে একটি অতি প্রাচীন শিব মন্দির আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে এই মন্দিরে একটি মেলা হয়।



মহীপুরের ধ্বংসাবশেষ

জয়পুরহাট স্টেশন হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বদিকে **কেন্দুল** গ্রামে জয়দেবের দীঘি, জয়দেবের ভিটা, শূলপাণির দীঘি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মনে করেন এই গ্রামই গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের জন্মস্থান।



নিমাই সাহার দরগা, কসবা উচাই

**পাঁচবিবি**—কলিকাতা হইতে ২০১ মাইল দূর। স্টেশন হইতে ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে **মহীপুর, আটাপুর, কসবা-উচাই** প্রভৃতি গ্রাম ব্যাপিয়া বিস্তৃত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলির সহিত পালবংশীয় নৃপতি মহীপালদেবের

সংস্রব আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। মহীপুরে প্রাপ্ত একটি অতিকায় বোধিসত্ত্ব লোকনাথ মূর্ত্তি ও একটি ধাতু নির্ম্মিত চতুর্ভূজা "শ্রী" মূর্ত্তি রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। এখানে নিমাই সাহা নামে এক ফকিরের দরগাহ



নিমাই সাহার দরগার নিকটস্থ কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরস্তম্ভের পাদপীঠ

আছে। এই দরগাহের নিকট তুলসীগঙ্গা নদীর তীরে চৈত্র-সংক্রান্তিতে স্নান-উপলক্ষে একটি মেলা বসিয়া থাকে। ইহা পাথরঘাটার মেলা নামে পরিচিত। ভগ্নস্তূপের অনেক প্রস্তরখণ্ড জমা হইয়াছে বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছে পাথরঘাটা। কোন কোন



তুলসীগঙ্গা, কসবা উচাই

ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, যে স্থানে নিমাই সাহার দরগাহ্ অবস্থিত, পূর্ব্বে সেখানে একটি বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ ছিল।

পাঁচবিবি হইতে প্রায় ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে **বলিগ্রাম** নামক গ্রামে বহু ধ্বংসাবশেষ আছে। বলিগ্রাম ক্ষেতলাল থানার অন্তর্গত এবং ক্ষেতলাল হইতে প্রায় ১০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। কিংবদন্তী, এই স্থানে বলিরাজার প্রাসাদ ও রাজধানী ছিল। বলিগ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত **শিলিমপুর** গ্রামেও বহু ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই গ্রামে একটি প্রস্তরে খোদিত প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। বলিগ্রামের এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে **মাথরাই** গ্রামেও একটি রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে; এইস্থান হইতে প্রাপ্ত তিনটি প্রকাণ্ড প্রস্তর স্তম্ভ রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। স্তম্ভগুলির শীর্ষদেশে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে খোদিত আছে "আদেশ বিপক্ষিক শ্রীপ্রহাসিত শর্ম্মা।" শিলিমপুরের প্রস্তর-প্রশস্তি পাঠে জানা যায় যে পূর্ব্বকালে বলিগ্রাম ও শিলিম-পুরের নাম ছিল বালগ্রাম ও শীয়ম্বপুর; এই বালগ্রাম ছিল পুণ্ড্রজনপদের অন্তর্ভুক্ত



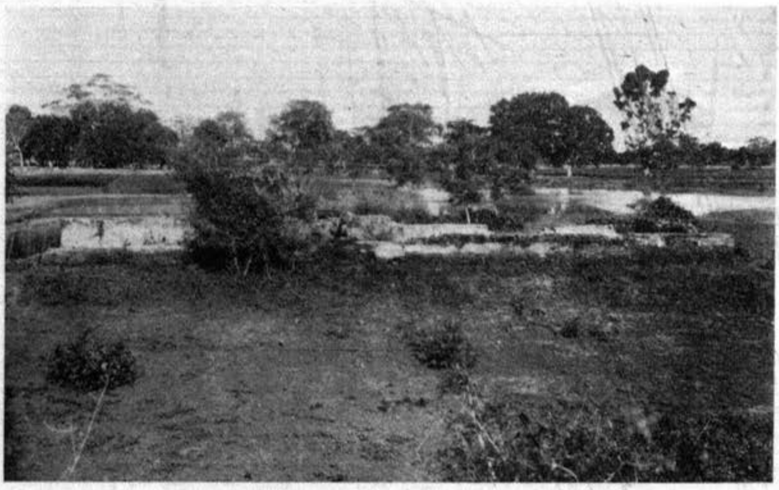
বিষ্ণু বিগ্রহ, কসবা উচাই

ও বরেন্দ্রভূমের অলঙ্কারস্বরূপ। বালগ্রামে ও শীয়ম্বপুরে নানা শাস্ত্রবিদ বহু পণ্ডিত ও গুণীর বাস ছিল। প্রশস্তিটি শীয়ম্বপুর গ্রামের প্রহাস শর্ম্মার কুলপ্রশস্তি। কার্ত্তিকেয়পুত্র প্রহাস বহু শাস্ত্রে পারদর্শী ও বহু সদ্গুণের আকর ছিলেন বলিয়া জনসাধারণের এবং সমসাময়িক নৃপতিপুঞ্জের সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। কামরূপরাজ জয়পালদেব তুলাপুরুষ দান উপলক্ষে প্রহাসকে নয়শত স্বর্ণমুদ্রা ও সহস্র মুদ্রার আয়যুক্ত ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য বহু অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রহাস তাহা গ্রহণ করেন নাই। প্রহাসের নানারূপ ধর্ম্মপালন ও পুণ্য কার্য্যের মধ্যে প্রধান হইল শীয়ম্বপুর গ্রামে অতি উচ্চ একটি শুভ্র মন্দিরে অমরনাথ বিগ্রহ স্থাপন। বিগ্রহের সেবার জন্য তিনি ভূমি দান করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পুত্রগণের উপর সংসার-ভার দিয়া তিনি গঙ্গাকূলে বাস করিয়া ধর্ম্মসাধনে মনোনিবেশ করেন। প্রহাসশর্ম্মার সময় আনুমানিক খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী।

পাঁচবিবির নিকটস্থ জঙ্গলে বাঘ, চিতা, বন্য বরাহ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

**হিলি**—কলিকাতা হইতে ২০৭ মাইল দূর। ইহা বগুড়া জেলার অন্তর্গত চাউল ও পাটের একটি বিখ্যাত গঞ্জ। এখানে অনেকগুলি চাউলের কল আছে।

হিলি হইতে দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত **বৈগ্রামে** সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক খননের দ্বারা একটি পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা "শিবের মণ্ডপ" নামে পরিচিত একটি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। স্তূপটির উচ্চতা প্রায় নয় ফুট, দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট ও বিস্তৃতি ৫৬ ফুট। খননের পূর্ব্বে ইহা লতা গুল্মাদির দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। ইহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত একটি লুপ্তপ্রায় পুষ্করিণী হইতে ১২৮ গুপ্তাব্দে ( ৪৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে ) উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পর এই স্তূপটির প্রতি শিক্ষিত ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পতিত হয় এবং তাহার ফলেই এখানে খননকার্য্য আরম্ভ

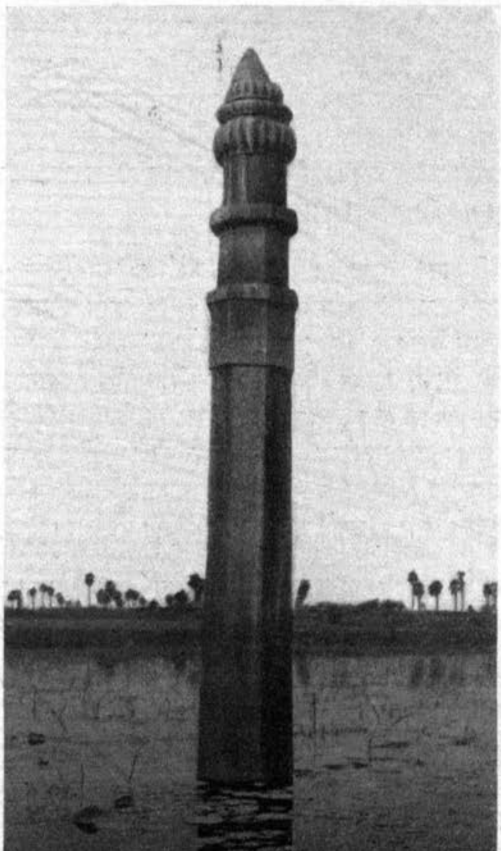


প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, বলিগ্রাম

হয়। উক্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে বাইগ্রামে ( বৈগ্রামে ) শিবনন্দী নামক জনৈক ব্যক্তির দ্বারা একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। খননের দ্বারা মন্দিরের গর্ভগৃহ, দেববিগ্রহের পাদপীঠ ও চতুর্দ্দিকের প্রাচীরাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে ইহা একটি শিবমন্দির ছিল। ইহার "শিবের মণ্ডপ" নামও এই অনুমানের সমর্থন করে। বাংলার অন্যতম পুরাকীর্ত্তি হিসাবে ইহা একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

হিলি হইতে মোটরবাস যোগে ১৬ মাইল পশ্চিমে দিনাজপুর জেলার অন্যতম মহকুমা **বালুরঘাট** যাওয়া যায়। বালুরঘাটে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের একটি আউট এজেন্সী আছে। আত্রাই নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটির দৃশ্য অতি সুন্দর।

বালুরঘাট হইতে প্রায় ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত **মৌজাদিবর** নামক গ্রামে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ ও হাজার বছরেরও অধিক পুরাতন একটি জলাশয় আছে। উহা দিবর দীঘি নামে পরিচিত। এই দীঘির মধ্যে প্রায় ৪১ ফুট উচ্চ এবং ১০ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি অষ্টকোণ গ্রানাইট প্রস্তরের স্তম্ভ আছে। ইহার শীর্ষদেশে লৌহের কাজের কিছু কিছু চিহ্ন আছে। ইহা মহারাজ দিব্যের জয়স্তম্ভ। মহারাজ দিব্য ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ( সান্তাহার দ্রষ্টব্য )।



মহারাজ দিব্যের জয়স্তম্ভ। (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

হিলি স্টেশন হইতে ১৮ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত করতোয়া তীরবর্ত্তী **ঘোড়াঘাট** এক সময়ে প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। ঘোড়াঘাট দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ও রংপুর জেলার সীমানার ধারেই বগুড়া জেলার অনতিদূরে অবস্থিত। কিংবদন্তী, এই স্থানে মহাভারতোক্ত বিরাটরাজার অশ্বশালা ছিল বলিয়া ইহার নাম ঘোড়াঘাট হয়। নসরত সাহ

যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সেই সময়ে রংপুর জেলার অন্তর্গত কাঁটাদুয়ারের রাজা নীলাম্বর ঘোড়াঘাটের অধিপতি ছিলেন বলিয়া কথিত। এই স্থানে তাঁহার একটি অরণ্য-পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। নসরত শাহের সেনাপতি প্রসিদ্ধ মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক গাজী ইসমাইল নীলাম্বরকে পরাস্ত করিয়া এই দুর্গ অধিকার করেন ও এই স্থানের "নসরতাবাদ" নাম দেন। গাজী ইসমাইলের চেষ্টায় এখানে একটি শহর গড়িয়া উঠে। উত্তরকালে মুঘলেরা যখন আসাম ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হন, তখন ঘোড়াঘাট মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের প্রধান সেনানিবাস হইয়া উঠে। কালবশে করতোয়ার প্রবাহ কমিয়া গেলে স্থানটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে এবং এই স্থানের ফৌজদারি রংপুরে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। ঘোড়াঘাটের প্রাচীন কীর্ত্তির অধিকাংশই নদী গর্ভসাৎ হইয়াছে তবে মুঘল আমলের ফৌজদারের প্রাসাদের এবং একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। ঘোড়াঘাটের দুর্ভেদ্য দুর্গবিজয়ী গাজী ইসমাইলের সমাধি এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই এই সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

**চরকাই**—কলিকাতা হইতে ২১৫ মাইল দূর। স্টেশন হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বদিকে করতোয়ার পরিত্যক্ত খাতের উপর অবস্থিত **নবাবগঞ্জ** গ্রামে সীতাকোট নামে পরিচিত একটি প্রাচীন ইষ্টকস্তূপ আছে। নিকটেই "তর্পণ ঘাট" নামে করতোয়ার একটি ঘাটও আছে। প্রবাদ এই ঘাটে রামায়ণ প্রণেতা মহামুনি বাল্মিকি স্নান ও তর্পণ করিতেন এবং নিকটেই অধুনা-অজ্ঞাত কোন স্থানে তাঁহার আশ্রম ছিল। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে এই স্থানেই বনবাস দিয়া গিয়াছিলেন। সীতা-কোট নামটি অতীত যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। আজিও বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে উত্তর বঙ্গের নানাস্থানের লোকে তর্পণ ঘাটে স্নান করিয়া থাকেন।

নবাবগঞ্জ থানা হইতে ৫।৬ মাইল দূরে জঙ্গলমধ্যে একটি ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়; উহা বাণরাজার বাড়ী বলিয়া পরিচিত।

**ফুলবাড়ী**—কলিকাতা হইতে ২২২ মাইল। স্টেশনের নিকটেই **দামোদরপুর** গ্রামে হরিপুকুর ও খোলাকুটী পুকুরের মধ্য দিয়া পথ তৈয়ার করিবার সময় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পাঁচখানি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়। এইগুলি রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি কুমার গুপ্তের, দুইটি বুধ গুপ্তদেবের রাজ্যকালের ও একটি ভানু গুপ্তদেবের রাজ্যকালের। এগুলি তাম্রশাসন নহে, ইহার প্রথমটির তারিখ ১২৪ গৌপ্তাব্দ বা ৪৪৩ খৃষ্টাব্দ এবং শেষটির ২১৪ গৌপ্তাব্দ বা ৫৩৩ খৃষ্টাব্দ। এই তাম্রলিপিগুলি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে দেড় হাজার বছর পূর্ব্বেও বরেন্দ্রভূমির উত্তরভাগ কোটীবর্ষ নামে খ্যাত ছিল এবং গঙ্গার উত্তর তীরের ভূভাগ পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামে পরিচিত ছিল ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

**পার্ব্বতীপুর জংশন**—কলিকাতা হইতে ২৩৪ মাইল দূর। ইহা পূর্ব্ববঙ্গ রেল-পথের একটি প্রধান জংশন। এখান হইতে মাঝারি মাপের রেলপথে পশ্চিমে দিনাজপুর, কাটিহার, পূর্ণিয়া, যোগবণী প্রভৃতি স্থানে ও পূর্ব্বদিকে রংপুর, কুচবিহার, ধুবড়ী, পাণ্ডু

প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। রেলের কল্যাণে পার্ব্বতীপুর একটি নগণ্য পল্লী হইতে একটি বৰ্দ্ধিষ্ণু শহরে পরিণত হইয়াছে।

পার্ব্বতীপুরের অনতিদূরে প্রাচীন বাংলার একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহা বিরাট রাজার সীমান্তরক্ষী দুর্গ ছিল বলিয়া কথিত। প্রবাদ এই দুর্গে বিরাট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক কীচক বাস করিয়াছিলেন। দুর্গটির আকৃতি সমচতুষ্কোণ ও পরিমাণফল প্রায় অর্দ্ধ মাইল। দুর্গের পরিখা ও প্রাকার গভীর জঙ্গলের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। পার্ব্বতীপুরের থানার নিকটবর্ত্তী একটি প্রাচীন বৃক্ষের তলদেশে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত লাঙ্গল ও কৃষি কার্য্যের উপযোগী প্রস্তর নির্ম্মিত আরও কয়েকটি দ্রব্য আছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে এইগুলি কীচকের নিধনকর্ত্তা মধ্যম পাণ্ডব ভীমের পরিত্যক্ত দ্রব্য। এই বস্তুগুলির সহিত ক্ষৌণীনায়ক ভীমের ("সান্তাহার" ও "জয়পুরহাট" দ্রষ্টব্য) কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই।

**সৈয়দপুর**—কলিকাতা হইতে ২৪৩ মাইল দূর। ইহা রংপুর জেলার অন্তর্গত একটি বৰ্দ্ধিষ্ণু স্থান। এখানে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের মাঝারি মাপের ইঞ্জিন ও গাড়ী মেরামত ও প্রস্তুত করিবার কারখানা অবস্থিত। এই কারখানায় চার পাঁচ হাজার লোক কাজ করে। সৈয়দপুরে ট্রাফিক বিভাগের একটি ডিষ্ট্রিক্ট বা জেলার সদর অবস্থিত। এখানকার রেলওয়ে উপনিবেশটি একটি সুদৃশ্য শহর। আধুনিক সভ্যতার প্রায় সকল রকম সুবিধাই এখানে আছে। সৈয়দপুর পাটের একটি প্রধান গঞ্জ।

**দরওয়ানি**—কলিকাতা হইতে ২৫০ মাইল দূর। ইহা রংপুর জেলার একটি বিখ্যাত পাটের গঞ্জ। স্টেশনের অনতিদূরে একজন পীরের সমাধি আছে। তথায় প্রতি বৎসর পৌষ-মাঘ মাসে একমাস স্থায়ী একটি বিরাট মেলা হয়। এই মেলায় হাতী, ঘোড়া, উট, মহিষ, গরু ও ভেড়া প্রভৃতি পশু কিনিতে পাওয়া যায়।

**নীলফামারি**—কলিকাতা হইতে ২৫৫ মাইল দূর। স্টেশন হইতে নীলফামারি শহরের দূরত্ব দুই মাইল। ইহা রংপুর জেলার একটি মহকুমা। এক বিস্তীর্ণ ও সমতল বালুকাময় ক্ষেত্রের উপর শহরটি অবস্থিত। কথিত আছে, পূর্ব্বে এখানে যথেষ্ট নীলের চাষ হইত বলিয়া স্থানের নাম নীলফামারি হয়। এখনও একটি পুরাতন নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

**ডোমার**—কলিকাতা হইতে ২৬৬ মাইল দূর। ইহা একটি বৰ্দ্ধিষ্ণু শহর ও বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। করতোয়ার প্রবাহ হ্রাসের পর ঘোড়াঘাটের পতন ঘটিলে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ডোমারের অভ্যুদয় ঘটে।

ডোমারের নিকটবর্ত্তী পাঙ্গা গ্রামে জনৈক পীরের আস্তানা আছে। সাধারণতঃ ইনি "পাঙ্গা পীর" নামে পরিচিত। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে এই পীরের উরস্ বা মৃত্যুতিথি উপলক্ষে এই স্থানে একমাসব্যাপী মেলা হইয়া থাকে। দরওয়ানির মেলার ন্যায় এই মেলায়ও বিস্তর গৃহপালিত পশুর ক্রয়-বিক্রয় চলে। স্টেশন হইতে সাড়ে চার

মাইল উত্তর-পশ্চিমে দেবীগঞ্জ একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ইহা কোচবিহার মহারাজার চাকলাজাত জমিদারীর সদর তহশীল।

**হল্‌দিবাড়ী**—কলিকাতা হইতে ৩০০ মাইল। এই স্থানটি পাটের কারবারের জন্য বিখ্যাত। ইহা কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত।

**জলপাইগুড়ি**—কলিকাতা হইতে ২৯৬ মাইল দূর। ইহা জলপাইগুড়ি জেলার ও রাজশাহী বিভাগের সদর শহর। শহরটি ত্রিস্রোতা বা তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত। শহরের মধ্য দিয়া কার্‌লা নামক একটি ছোট নদী প্রবাহিতা। শহরটির দৃশ্য অতি সুন্দর। কার্‌লা নদীর লৌহসেতু হইতে মেঘ ও কুয়াসামুক্ত পরিষ্কার দিনে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের মহান্ দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। জলপাইগুড়ি চায়ের ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। এই জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে বহু চা-বাগান আছে। শহরে ডাকবাংলা, হোটেল, ধর্ম্মশালা ও সরাই প্রভৃতি আছে। ইহা একটি উন্নতিশীল স্থান। এখানে একটি মেডিক্যাল স্কুল ও মেয়েদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। এই শহরে পিচ্ দেওয়া রাস্তা, কলের জল, বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন ও সর্ব্বপ্রকার যান-বাহন আছে। কথিত আছে, এই স্থানে পূর্ব্বে প্রচুর জলপাই গাছ ছিল বলিয়া জলপাইগুড়ি নাম হইয়াছে। তিস্তা নদীর অপর পারে শহরের ঠিক বিপরীত দিকে "বার্ণেজ ঘাট" নামে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের একটি স্টেশন আছে।

জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশ স্থান পূর্ব্বে প্রাচীন কামতাপুর ও কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহার পূর্ব্বাঞ্চল বা ডুয়ার্স প্রদেশ ভূটান রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূটানী ভাষায় ডুয়ার্স কথাটির অর্থ দুয়ার, দ্বার বা সীমান্ত। ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব্বে ভূটিয়ারা দুয়ার অঞ্চল কোচবিহার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন এই প্রদেশ ভূটিয়াদের হস্তচ্যুত হইয়া ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয় তখন ইহাকে দুই অংশে ভাগ করা হয়। পূর্ব্বাংশ আসামের গোয়ালপাড়া জেলার সহিত সংযুক্ত হয় এবং পশ্চিমাংশ লইয়া "ওয়েষ্টার্ণ ডুয়ার্স" নামে বাংলার একটি নূতন জেলা গঠিত হয় এবং একজন ডেপুটি কমিশনারের উপর উহার শাসনভার অর্পিত হয়। ঐ সময় বর্ত্তমান জলপাইগুড়ির "রেগুলেশন" অঞ্চল রংপুর জেলার অধীন ছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলকে রংপুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া "ওয়েষ্টার্ণ ডুয়ার্সের" সহিত সংযুক্ত করা হয় এবং জলপাইগুড়ি নামে একটি নূতন জেলা গঠিত হয়। ডুয়ার্স অঞ্চল এখনও "নন্ রেগুলেটেড" বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহির্ভূত অঞ্চল।

জলপাইগুড়ি জেলায় দুইটি পুরাকীর্ত্তি আছে। একটি তিস্তার অপর পারে জলপাইগুড়ি শহর হইতে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত জল্পেশ্বর মন্দির। ইহা একটি বিখ্যাত শৈবপীঠ; শিবরাত্রির মেলার সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। মেলাতে অনেক পাহাড়িয়া জাতীয় লোক আসে এবং নানাপ্রকার জীব-জন্তুর ক্রয়-বিক্রয় হয়। সুন্দর সুন্দর ভূটানী কুকুর এই সময় কিনিতে পাওয়া যায়। জল্পেশ লিঙ্গ ভূগর্ভে প্রোথিত। প্রবাদ যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (বর্ত্তমান গৌহাটী) রাজ্যের রাজা

জল্পেশ্বর গভীর অরণ্যমধ্যে এই অনাদি শিবলিঙ্গকে আবিষ্কার করেন। মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তিনি স্বীয় নামে শিবলিঙ্গের নামকরণ করেন। তৎপ্রণীত আদি মন্দির ধ্বংস হইয়া গেলে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে কোচবিহারাধিপতি রাজা প্রাণনারায়ণ জল্পেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরটির শিরোভাগে একটি গোলাকৃতি গুম্বজ থাকায় উহা দূর হইতে মস্‌জিদের মত দেখাইত। বর্ত্তমানে "জল্পেশ টেম্পল কমিটি" নামক সমিতি কর্ত্তৃক ইহা সংস্কৃত ও পুনর্গঠিত হওয়ার ফলে ইহার পূর্ব্বরূপ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন এই মন্দির দেখিয়া ইহাকে নিতান্তই আধুনিক বলিয়া মনে হয়। জল্পেশ মন্দিরের প্রথম তলটি চতুষ্কোণাকৃতি এবং প্রত্যেক কোণে একটি করিয়া ঘর আছে।



জল্পেশ্বরের পুরাতন মন্দির

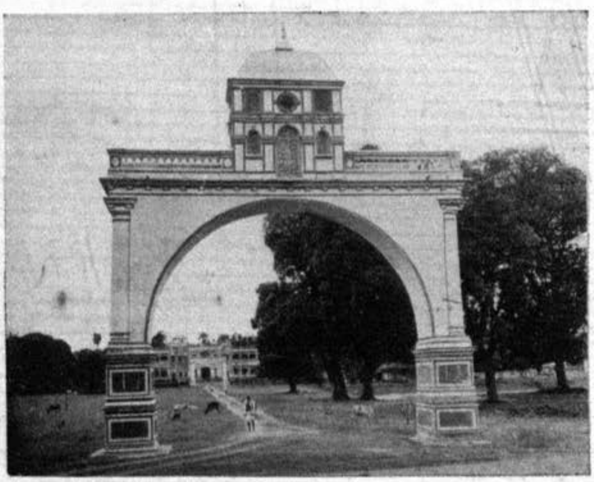
প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন যে জল্পেশ লিঙ্গ বলিয়া যাহা অধুনা পূজিত, উহা মূলে একখণ্ড প্রস্তরমাত্র এবং স্থানীয় অরণ্যবাসী অনার্য্যগণই উহার প্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। শিবশতনাম স্তোত্রে উল্লিখিত আছে "অহং কোচবধূপুরে জল্পেশ্বর ইতীরিতঃ" অর্থাৎ কোচবিহার রাজ্যে আমি জল্পেশ্বর নামে পরিচিত। জল্পেশ মন্দিরের দক্ষিণে যে সুন্দর জলাশয়টি আছে উহা হইতে প্রাপ্ত একটি বাসুদেব মূর্ত্তি অপর একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি শহর হইতে নয় দশ মাইল পশ্চিমে ভিতরগড় নামক একটি বিস্তৃত ও সুরক্ষিত প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রবাদ, ইহা পৌরাণিক যুগের পৃথুরাজার রাজধানী। ইহাতে পর পর চার প্রস্থ বেষ্টনীর মধ্যে গড় ও চারিদিকে পরিখা এবং দুর্গের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ভগ্ন প্রাসাদের পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড নির্ম্মল সলিলা দীঘি বিদ্যমান আছে। দীঘিটি "মহারাজ দীঘি" নামে পরিচিত এবং ইহাতে দশটি ঘাটের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কীচক নামক এক যাযাবর অস্পৃশ্য জাতির সংস্পর্শে ধর্ম্মলোপের ভয়ে

পৃথুরাজা নাকি এই দীঘির জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। কীচক জাতি এখন বিলুপ্তপ্রায়। জলপাইগুড়ির বনে জঙ্গলে এখনও সামান্য দুই চার ঘর কীচকের বাস আছে। বন্য পশুপক্ষী প্রভৃতি শিকার করিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

গড়ের উত্তরদিকস্থ তালমা নদী হইতে পরিখার জল লওয়া হইত। প্রাসাদ এবং মহারাজ দীঘি ঘেরিয়া নগরটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৯৩০ গজ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩৪৫ গজ। মধ্যবর্ত্তী নগরীটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৩৫৩০ গজ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৬৩৫০ গজ, ইহার দক্ষিণে বাঘপুখোরী নামে একটি পুষ্করিণী আছে, উহার নিকটে নাকি রাজা কতকগুলি বাঘ রাখিতেন। বাহিরের নগরীটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় চার মাইল হইবে। ইহাতে নিম্নতম স্তরের অধিবাসীরা বাস করিত এবং ইহার নাম ছিল হরির ঘর।

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে কাম্বোজ বা তিব্বতীয়গণের আক্রমণ হইতে উত্তরবঙ্গ রক্ষা করিবার জন্য বাংলার পালবংশীয় রাজারা এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।



জলপাইগুড়ি রাজবাড়ীর তোরণ

জলপাইগুড়ি জেলার পুরাতন ইতিহাসের সহিত সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণীর" ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জলপাইগুড়ির "রেগুলেশন" অঞ্চল অর্থাৎ শিলিগুড়ির নিকটস্থ তিস্তা তীরবর্ত্তী বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল মহাল, চিলহাটির নিকটবর্ত্তী বোদা এবং তিস্তার পূর্ব্বপারে পাটগ্রাম পরগণা পূর্ব্বে কোচবিহাররাজের অধিকৃত ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই পরগণাগুলি মুঘলদের অধিকারভুক্ত হইয়া সীমান্তের ফকিরকুণ্ডি (বর্ত্তমান রংপুর) নামক ফৌজদারীর অধীন হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ফকিরকুণ্ডির দেওয়ানি লাভ করিয়া ইতিহাস-কুখ্যাত দেবীসিংহকে উহার ইজারাদার নিযুক্ত করেন। দেবী-সিংহের অমানুষিক অত্যাচারে কৃষকেরা বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহ দমন করিতে

কোম্পানিকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। একদল ব্রিটিশ সৈন্য কৃষকদের নিকট পরাজিত হয় এবং ক্যাপ্টেন টমাসের অধীন অপর একদল সৈন্যকে তাহারা অবরুদ্ধ করে। রংপুরের বরকন্দাজ বা লাঠিয়াল দ্বারা গঠিত একটি দেশীয় সৈন্যবাহিনীকে অপর তিন দল সৈন্যের সহিত বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। এই সম্মিলিত সেনাবাহিনী কৃষকদিগকে তাড়িত করিয়া বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের মধ্যে অবরুদ্ধ করে এবং তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। কৃষকদের মধ্যে অনেকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় এবং ইংরেজ আদালতে তাহাদের যথাযোগ্য শাস্তিও হয়। বিদ্রোহী কৃষকদের আশ্রয়স্থান বৈকুণ্ঠপুরের অরণ্য বর্ত্তমানে বহুলাংশে পরিষ্কৃত হইয়া চা-বাগানে পরিণত হইয়াছে। কোচবিহার রাজবংশের সমগোত্র বৈকুণ্ঠপুরের প্রসিদ্ধ "রায়কত" উপাধিধারী ভূম্যধিকারীর শিকারপুর নামক চা-বাগান এইরূপ পরিষ্কৃত অঞ্চলে জঙ্গলের সীমান্তে অবস্থিত। এই চা-বাগানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সুদৃশ্য মন্দিরের সহিত জনশ্রুতি অনুসারে দেবীরাণী বা দেবী চৌধুরাণীর স্মৃতিবিজড়িত। বৈকুণ্ঠপুর বনানীর প্রান্ত দিয়া "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসে বর্ণিত ত্রিস্রোতা নদী আজিও প্রবাহিতা। অনেকের ধারণা নিকটবর্ত্তী দেবীগঞ্জ, দেবীঘাট ও দেবীডোবা প্রভৃতি পল্লীগুলি কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কৃষকগণের নেতৃস্থানীয়া উপন্যাস বর্ণিতা দেবী চৌধুরাণীর বাস্তবতার স্মৃতি বহন করিতেছে।

জলপাইগুড়ি হইতে প্রায় ২৪ মাইল পশ্চিমে মহানদীর তীরে **তিতালিয়া** গ্রাম অবস্থিত। এক কালে ইহা পুরাতন রংপুর জেলার একটি মহকুমা-সদর ছিল। এখন ইহা জলপাইগুড়ি সদরের অন্তর্গত। জলপাইগুড়ি হইতে তিতালিয়া পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা আছে। এখনও বাজারের নিকট অনেকগুলি সুন্দর পাকা বাড়ী এবং পরিত্যক্ত ঘোড়-দৌড়ের মাঠ তিতালিয়ার পুরাতন গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ের উপর এখানকার ডাক বাংলাটির অবস্থান অতি মনোরম। তিতালিয়া শিলিগুড়ি হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্যাঞ্জেস্-দার্জ্জিলিং রোডের উপর অবস্থিত।

**শিলিগুড়ি**—কলিকাতা হইতে ৩১৮ মাইল দূর। ইহা পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রধান লাইনের শেষ স্টেশন। শিলিগুড়ি পূর্ব্বে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। রেলের কল্যাণে এখন ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু নগরে পরিণত হইয়াছে। ইহা এখন দার্জ্জিলিং জেলার একটি মহকুমা। ইহার চারিদিকে বহু চা-বাগান হওয়ায় এখানকার শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে।

শিলিগুড়ি শহরটি বিস্তৃত মাঠের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। চারিদিক বেড়িয়াই হিমালয়ের পাদমূলে তরাইয়ের দুর্গম অরণ্য। এই গভীর জঙ্গলে নানাবিধ হিংস্র জন্তুর বাস। শিলিগুড়ি হইতে যে কোন দিকে ভ্রমণে বাহির হইলেই হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। তরাইয়ের গভীর অরণ্যপ্রান্ত হইতে ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মত একটির পর একটি পর্ব্বতশ্রেণী নীল আকাশের সহিত মিলাইয়া গিয়াছে।

শিলিগুড়ি নামটি কোচদিগের প্রদত্ত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার অর্থ পাথুরে জায়গা, নিকটস্থ মহানদীতে হিমালয় হইতে আনীত প্রস্তরখণ্ডের স্তূপ হইতে এই নামের উৎপত্তি।

শিলিগুড়ি সম্বন্ধে প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে Himalayan Journals প্রণেতা বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌ স্যার জে ডালটন হুকার (Sir Joseph Dalton Hooker) লিখিয়াছিলেন, "আমি শিলিগুড়ির কাছাকাছি ঢেউয়ের মত উঁচুনীচু কঙ্করাকীর্ণ তেরাইয়ের বনভূমির নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি। যে অল্প সময় শিলিগুড়িতে ছিলাম, তাহা আমার কাছে বেশ ভাল লাগিয়াছিল। শিলিগুড়ির চারিদিকের ভূমি ঢেউয়ের মত উঁচুনীচু।"

এই শহরে হিন্দুদের দেবমন্দির ও মুসলমানদের কয়েকটি মস্‌জিদ আছে। হোটেল, ধর্ম্মশালা, ডাকবাংলা থাকায় এখানে যাত্রীদের আহারাদির ও বাসস্থানের কোনও অসুবিধা নাই। ব্যবসায়িগণের মধ্যে মাড়োয়ারীদের সংখ্যাই বেশী।

বর্ত্তমান সময়ে শিলিগুড়ি একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান হইতে তিব্বতের পশম, মৃগনাভি, চা, কমলা, শালকাঠ ও অন্যান্য মূল্যবান কাঠ নানাস্থানে রপ্তানি হয়।

তরাইএর কার্য্যের জন্য কার্সিয়ংএর সদর-আলার অধীন একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এখানে থাকেন। পূর্ব্বে ইহার দপ্তর ছিল শিলিগুড়ি হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে ফাঁসী-দেওয়া গ্রামের নিকটস্থ হাঁসকুয়ার বা হাঁসখাওয়া গ্রামে। রেলপথ খুলিবার পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার দপ্তর শিলিগুড়িতে উঠিয়া আসে।

শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলপথ নামক ২-ফুট গেজের রেলপথ আরম্ভ হইয়াছে; এখানে গাড়ী বদল করিতে হয়। এই রেলপথের প্রধান লাইন উত্তর-পশ্চিমে কার্সিয়ং হইয়া ৫১ মাইল দূরবর্ত্তী দার্জ্জিলিং গিয়াছে। একটি শাখা লাইন ৭০ মাইল দূরবর্ত্তী পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত কিষণগঞ্জ গিয়াছে। অপর একটি শাখা তিস্তা-উপত্যকা দিয়া কালিম্পং অভিমুখে শিলিগুড়ি হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী গেলিখোলা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই সকল স্থানে শিলিগুড়ি হইতে মোটরযোগেও যাওয়া যায়।

পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং যাইতে হইলে কলিকাতা হইতে পূর্ব্ব-ভারত রেলপথে ট্রেণে সাহেবগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়া তাহার পর নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া গরুর গাড়ী, পাল্কী বা ঘোড়ায় করিয়া গ্যাঞ্জেস্‌-হিমালয়ান রাস্তা ধরিয়া পূর্ণিয়া, কিষণগঞ্জ, তিতালিয়া ও শিলিগুড়ি হইয়া প্রায় দুই শত মাইল অতিক্রমের পর দার্জ্জিলিং পৌঁছাইতে হইত। ইহাতে প্রায় এক পক্ষকাল সময় লাগিত। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ি পৌঁছাইলে তথা হইতে টাঙ্গা করিয়া দার্জ্জিলিং যাইতে হইত। এইরূপ টাঙ্গার ব্যবস্থা ১০ বৎসর চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে এই ব্যবস্থার নানারূপ অসুবিধার জন্য ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের তৎকালীন সর্ব্বাধ্যক্ষ মিঃ ফ্রাঙ্কলিন প্রিস্‌টেজের পরিকল্পনা অনুযায়ী দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথের নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের

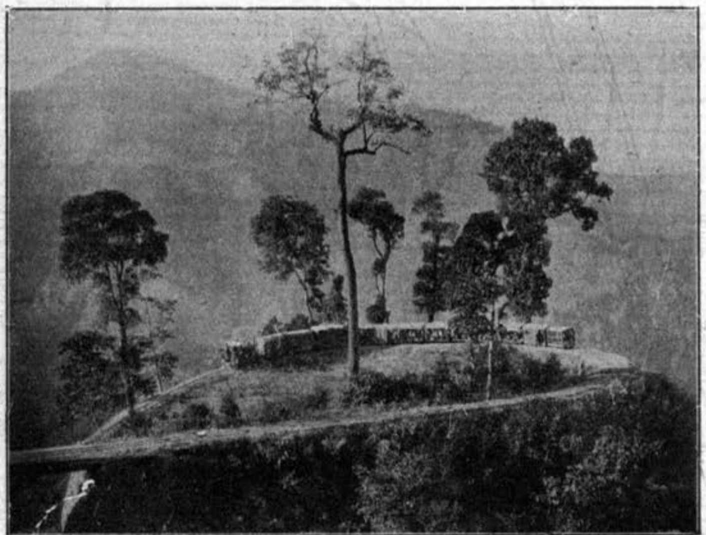
মধ্যে তিনধারিয়া পর্য্যন্ত রেলপথ খোলা হয় এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত লাইন সমাপ্ত হয়। এই পার্ব্বত্য রেলপথটিতে একটিও সুড়ঙ্গ না থাকায় ভ্রমণকারীর পক্ষে অন্যান্য পার্ব্বত্য রেলপথের ন্যায় সুড়ঙ্গমধ্যে ধোঁয়ার জন্য কষ্ট পাইতে হয় না এবং হিমালয়ের অপূর্ব্ব ও পরিবর্ত্তনশীল শোভা উপভোগ করিবার কোন বাধা হয় না। এই রেলপথের খেলাঘরের ন্যায় ছোট ছোট গাড়ী ও ইঞ্জিন দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য হন কেমন করিয়া ইহারা হিমালয়ের উচ্চ শিখরে উঠিবে। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে সে বিস্ময় আর থাকে না। ক্ষুদ্র ট্রেণ আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের গা দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা কৌশলে ক্রমে উপরে উঠিতে থাকে। এই পার্ব্বত্য রেলপথের ইঞ্জিনীয়রকে ইহার জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই কারণে দার্জ্জিলিং যাইতে এই রেলপথে ভ্রমণ বিশেষ উপভোগ্য অভিজ্ঞতা।

**দার্জ্জিলিংএর পথে**—শিলিগুড়ি স্টেশন ছাড়িয়াই পূর্ব্বদিকে তিস্তা উপত্যকা শাখা লাইন ফেলিয়া মহানদী সেতু পার হইয়া ৪ মাইল দূরবর্ত্তী **পঞ্চনই** জংশন পড়িবে। এই জংশন হইতে কিষণগঞ্জ শাখা বহির্গত হইয়াছে। পঞ্চনইএর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম চাঁদ-মণিতে চৈত্রমাসে দোলপূর্ণিমার সময় রাজবংশীদের বসন্ত উৎসব ও কামদেবের পূজা নৃত্যগীতাদি সহযোগে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। কিষণগঞ্জ শাখাপথের **বাঘডোগরা হাতিঘিষা** ও **নকসল বাড়ী** স্টেশন শিলিগুড়ি হইতে যথাক্রমে ১০, ১৪ ও ১৮ মাইল দূরে তরাইএর জঙ্গলমধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে বাঘের অত্যন্ত উবদ্রব ছিল বলিয়া বাঘডোগরা নাম হইয়াছে, হাতীর অত্যাচারের জন্য হাতিঘিসা ও নকসল অর্থে তিব্বতীয় ভাষায় শিকারের উপযোগী স্থান বলিয়া নাম হইয়াছে নকসল বাড়ী। ইহাদের পরের স্টেশন **বাতাসী** ও **আধকারী** দার্জ্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমায় অবস্থিত। তাহার পর পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমা আরম্ভ হইয়াছে। শেষোক্ত মহকুমায় এই শাখা লাইনে ইস্‌লামপুর থানা ও ঠাকুরগঞ্জ প্রধান স্টেশন। ইস্‌লামপুরে এ অঞ্চলের বড় হাট। ঠাকুরগঞ্জের একটি ধ্বংসাবশেষ বিরাট রাজার বাড়ী ছিল বলিয়া কথিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ত্রিকোণমিতিক মাপের সময় এখানে ক্ষোদিত লিপিযুক্ত কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। ঠাকুরগঞ্জ, শিলিগুড়ি ও কিষণগঞ্জ হইতে যথাক্রমে ৩৮ ও ৩২ মাইল।

কিষণগঞ্জ শাখা ছাড়িয়া দিয়া দার্জ্জিলিং অভিমুখে পঞ্চনই জংশনের পরের স্টেশন শিলিগুড়ি হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী **সুক্‌না**। এই পর্য্যন্ত রেলপথ প্রায় সমতল ভূমি দিয়া আসিয়াছে। পঞ্চনই ও সুক্‌নার মধ্যে রেলপথের উভয়দিকে চা-বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। সুক্‌না হইতে তরাইএর জঙ্গল এবং পাহাড়ের চড়াই আরম্ভ হইয়াছে। এখানকার পর হইতে বনানীর শোভা দেখিলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। যতদূর দেখা যায় কেবল তরুশ্রেণীর পর তরুশ্রেণী চলিয়াছে। বনবিহঙ্গের কূজন, পাহাড়িয়া নদীর কুলুকুলু রাগিনী ও ঝিল্লীরব শুনিতে শুনিতে কবির কথা মনে পড়িয়া যায়, "ঝিল্লী-মুখরিত বনপরিপূরিত কলয়তি মহানদী মৃদুলপ্রপাতে।" ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়া রেলপথ বিশাল হিমালয়ের সিঙ্গলীলা পর্ব্বতশ্রেণীর একটি বাহু বাহিয়া ক্রমেই উপরে উঠিতেছে।

ষাট মাইল দীর্ঘ এই পর্ব্বতশ্রেণীটি একদিকে নেপাল ও অপরদিকে সিকিম ও দার্জ্জিলিং জেলার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া উঠিতে উঠিতে কাব্রু, জন্নু ও কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তুঙ্গ শিখরে গিয়া শেষ হইয়াছে।

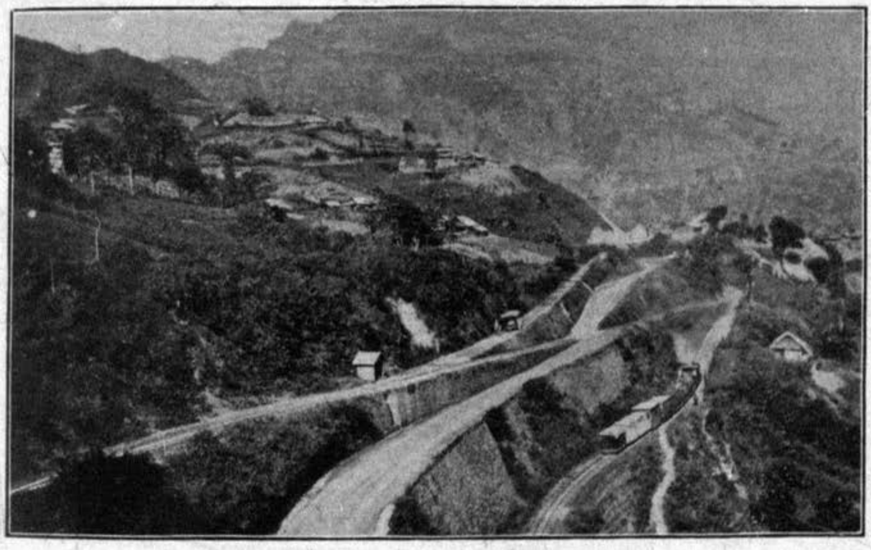
শিলিগুড়ি হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী পরবর্ত্তী **রংটং** পৌছাইবার পূর্ব্বেই রেলপথ ১নং লুপের সাহায্যে চক্রাকারে উপরে উঠিয়াছে। যেখানে পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া লাইন লইয়া যাইতে হইলে অনেকটা ঘুর হয়, সেইখানে লুপ বা চক্র তৈয়ার করিয়া সহজে গাড়ীকে উর্দ্ধে উঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। রংটং হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে রেলপথ সমতল ভূমি ছাড়িয়া পর্ব্বতগাত্রে অনেকদূর উপরে উঠিয়াছে।



তিনধারিয়া লুপ

রংটং পার হইয়া সু-উচ্চ সেলিম পাহাড় (৩,৫০০ ফুট) সম্মুখে দৃষ্ট হয় এবং কিছু পরেই ২নং লুপ বা চক্র দিয়া রেলপথ উপরে উঠিয়াছে। এই ২নং চক্রের নিকটে চিতাবাঘের উপদ্রব সুবিদিত। কথিত আছে কুড়ি বৎসরে এই স্থানে শতাধিক ব্যক্তি চিতাবাঘের আক্রমণে প্রাণ হারাইয়াছে। বনানী ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিতেছে। বহুপ্রকারের লতাগুল্মবৃক্ষাদিতে উপত্যকা ও গিরিসঙ্কট কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে চা-বাগান ও নিম্নের বিস্তৃত সমতল ভূমির দৃশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অল্প পরেই ৩নং বা চুণাভাটী চক্র পার হইয়া শিলিগুড়ি হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী **চুণাভাটী** ছাড়াইয়া কার্সিয়ংএর নিকটস্থ মহলদীরাম পর্ব্বতের কুব্জাকার শিখরদেশ (৭,০০০ ফুট উচ্চ) সিটং পাহাড় দৃষ্টিপথে পড়িবে।

এইবার সহজে পর্ব্বতগাত্রের উপরে উঠিবার অপর অবলম্বন প্রথম রিভার্স টি (reverse) আসিয়া পড়িবে ; ইহার সাহায্যে ট্রেণ প্রথমে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া পরে কিছু পিছু হটিয়া আবার সম্মুখে চলিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পথ ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে। প্রথম রিভার্স টির পরই শিলিগুড়ি হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী **তিনধারিয়া** স্টেশন। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তিনধারিয়ার উচ্চতা ২,৮২২ ফুট। এখানে দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ের গাড়ী ও ইঞ্জিনের কারখানা অবস্থিত। পূর্ব্বদিকে প্ল্যাটফরমের অপর ধারে ভূটানের রুক্ষ পর্ব্বতশ্রেণী এবং কিছু দক্ষিণদিকে তিস্তা ও মহানদী বাংলার সমতল ভূমিতে প্রবাহিতা দেখা যায়।



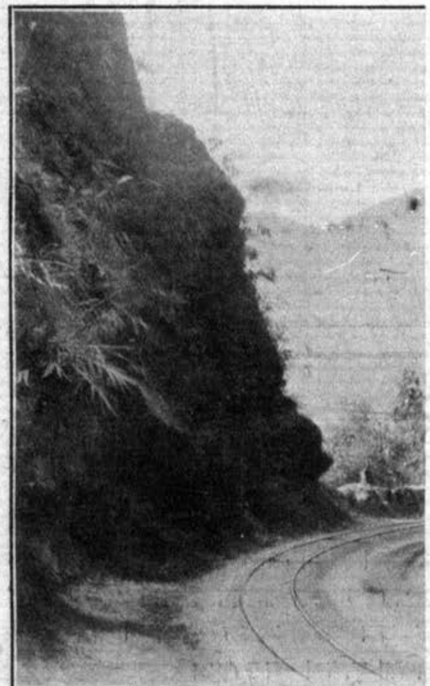
গয়াবাড়ীর নিকটবর্ত্তী দৃশ্য

তিনধারিয়া ছাড়িয়া যথাক্রমে ২ নং রিভার্স্, ৪ নং চক্র ও ৩ নং রিভার্স পার হইয়া শিলিগুড়ি হইতে ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী **গয়াবাড়ী** স্টেশন। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩,৪৮০ ফুট উচ্চ।

গয়াবাড়ীর পরই ৪নং বা শেষ রিভার্স টি পড়ে। এখানকার পাথর লক্ষ্য করিবার বিষয়; ভূতত্ত্ববিদ্গণ ইহার নাম দিয়াছেন "সিকিম নাইস"। কাছেই প্রসিদ্ধ **পাগ্‌লাঝোরার** নিকট জল লইবার জন্য গাড়ী থামে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ অধিক বারিপাতের জন্য ইহা ফাঁপিয়া ফুলিয়া উন্মত্ত বেগে বহিতে থাকে ; এই জন্য ইহা পাগলা আখ্যা পাইয়াছে। এখানে ছয় ঘণ্টার মধ্যে চৌদ্দ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বারিপাত হইতে দেখা গিয়াছে। পাগ্‌লা ঝোরা প্রথম প্রথম রেলপথের অনেক ক্ষতি করিয়াছিল ; এখন তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আনা হইয়াছে। এই উদ্দাম ও খেয়ালী জলধারাটিকে বন্ধননিপীড়িত দেখিয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথ ব্যথিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার কবিতায় পাগলাঝোরাকে তিনি অমর করিয়া গিয়াছেন। এই কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করা হইল ;—

"তোমরা কি কেউ শুনবে নাগো পাগ্‌লাঝোরার দুঃখ গাথা,
পাগল ব'লে কর্ব্বে হেলা ? কর্ব্বে হেলা মর্ম্ম ব্যথা ?
জন্ম আমার হিম উরসে কুলে আমার তুল্য নাই,
সিন্ধুনদের সোদর আমি গঙ্গাদিদির পাগলা ভাই।
তবুও শিকল পরিয়ে দিলে রাখলে আমায় বন্দীবেশে,
ক্ষুদ্র মানুষ স্বল্প আয়ু, আমায় কিনা বাঁধ্‌লে শেষে।
কৌশলে সে ফাঁদ ফেঁদেছে, পারিনে তায় ছিঁড়্‌তে বলে,
শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছি ক্রমে, পড়ছি গ'লে অশ্রুজলে।
আগে আমায় চিন্‌ত যারা বল্‌ছে শোনো যায়না চেনা।
বাজবে কবে প্রলয় বিষাণ—মুখে আমার উঠ্‌ছে ফেনা।
বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাক্‌বে আরো ?
রুদ্রতালে নাচব কবে ? তোমরা কেহ বল্‌তে পারো ?"



মহানদীর নিকটবর্ত্তী দৃশ্য

পাগ্‌লাঝোরা ছাড়াইয়া শিলিগুড়ি হইতে ২৮ মাইল দূরবর্ত্তী **মহানদী** স্টেশন ; স্টেশনের সম্মুখস্থ জঙ্গলাবৃত মহলদীরাম পর্ব্বত হইতে মহানদী বা মহানন্দার উৎপত্তি

হইয়াছে। এইরূপ অনুমিত হয় যে মহানদী নাম এই নদীর লেপ্‌চা নাম মহলদী কথার বাংলা অপভ্রংশ। মহলদীর অর্থ বাঁকা নদী; এই নামের কারণ এই যে পাহাড় হইতে দেখা যায় এই নদী সমতলক্ষেত্রে পৌঁছিয়া হঠাৎ দক্ষিণদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার সহিত তুলনা করিয়া লেপ্‌চারা তিস্তাকে বলে রংত্যু বা সোজা নদী, কারণ ইহাকে সমতলভূমিতে সোজা যাইতে দেখা যায়। মহলদীরাম পর্ব্বতের নামের অর্থ মহালদী নদীর উৎস-স্থল।

মহানদী ছাড়িয়া একটি কাটিং (পাহাড়কে গভীর করিয়া কাটিয়া দুই পার্শ্বে পাহাড়ের উচ্চ প্রাচীর রাখিয়া রাস্তা) পার হইলে দূরে সমতলক্ষেত্রের দৃশ্য অপরূপ সুন্দর দেখায়। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে পর পর তিস্তা, মহানদী ও বালাসন এই তিনটি নদীকে পরিষ্কার ও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বালাসন বা বালুআসন নাম হইয়াছে ইহার বিস্তৃত ও স্বর্ণাভ বালুকাপূর্ণ নদীগর্ভ হইতে। শীঘ্রই ট্রেণ গিধর পাহাড়ের মধ্যে এক কাটিং পার হইলে অকস্মাৎ সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত হইবে। যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, শ্রেণীর পর শ্রেণী পাহাড়ের সারি নীল কুয়াসায় মিশিয়া গিয়াছে; ইহাদের পাদদেশে তরাইয়ের ঘন জঙ্গলে অসংখ্য পার্ব্বত্য নদী ও নির্ঝরিণী সূর্য্যালোকে রূপার মত ঝিকি মিকি খেলিতেছে। ইহার পরেই কাসিয়ং স্টেশন।

**কার্সিয়ং**—ইহা শিলিগুড়ি হইতে ৩২ মাইল, কলিকাতা হইতে ৩৫০ মাইল এবং দার্জ্জিলিং হইতে মাত্র ২০ মাইল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৪৮৬৪ ফুট উচ্চ। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ইহা একটি বড় স্টেশন। কাসিয়ং দার্জ্জিলিং জেলার একটি মহকুমার সদর এবং দার্জ্জিলিংএর মত বড় শহর না হইলেও এ অঞ্চলে ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ।

হিমালয়ের তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গের মধ্যে এখান হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাব্রু ও জন্নুর কেবল শিখর দেশটুকু ঘুম পাহাড়ের উপর দিয়া জাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু কাসিয়ংএর প্রকৃত আকর্ষণ হইল দক্ষিণদিকে বাংলার বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির দৃশ্য। লক্ষ্য করিবার বিষয় এখান হইতে পাহাড় যেন অকস্মাৎ নিম্ন ভূমিতে নামিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায় তিস্তা, উহার পর বাম হইতে দক্ষিণে পর পর মহানদী, বালাসন ও নেপাল সীমান্তের মেচী নদী ও বন্য হস্তীর লীলাভূমি মোরুং জঙ্গল; উহার পর পরিষ্কার দিনে নেপালের মইখোলা ও জোক্‌মই নদীও দেখিতে পাওয়া যায়। তরাইএর জঙ্গল দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় মাঝে মাঝে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চাষ আবাদ করা হইয়াছে, এখানে ওখানে চা বাগানের কারখানার টিনের ছাদ নজরে পড়ে। ঘন সবুজ, ফিকে সবুজ প্রভৃতি সবুজ রংএর পার্থক্য দ্বারা এত দূর হইতেও চা, ধান বা পাটের চাষ সহজেই ধরিতে পারা যায়।

কার্সিয়ংএর পশ্চিমদিকে ঠিক নীচেই বালাসন উপত্যকা এবং উহার অপর পারে নাগরী ও মিরিক নামক শৈলবাহু।

দার্জ্জিলিং-এর মত উচ্চ নহে এবং এখানে অত বেশী শীত হয় না বলিয়া অনেকে দার্জ্জিলিং অপেক্ষা কার্সিয়ং পছন্দ করেন। এখানে দার্জ্জিলিং অপেক্ষা বৃষ্টি বেশী হয়। কার্সিয়ং-এর চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য চা বাগান হইয়াছে এবং এখান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের সমতল ভূমিতে নামিয়া যাইবার একটি পাকা রাস্তা আছে। শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং যাইবার পাকা রাস্তা কার্সিয়ং নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং এই রাস্তার উপরেই প্রধান বাজার। কার্সিয়ং-এ এখন দুই তিনটি স্কুল এবং অনেকগুলি বাড়ী হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান্ রেলের প্রধান আফিস দার্জ্জিলিং হইতে এখানে উঠিয়া আসায় কার্সিয়ং শহর খুব বড় হইয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত কার্সিয়ং সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তাহার পরে নেপালের গুর্খা রাজারা ইহা কাড়িয়া লন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরেজেরা গুর্খাদের হারাইয়া দিয়া উহা সিকিমের রাজাকে ফিরাইয়া দেন। সিকিমের রাজা ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এখানে ৫।৬ মাইল চওড়া পার্ব্বত্যভূমি ইংরাজ সরকারকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। একটি সামান্য গ্রাম হইতে কার্সিয়ং শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

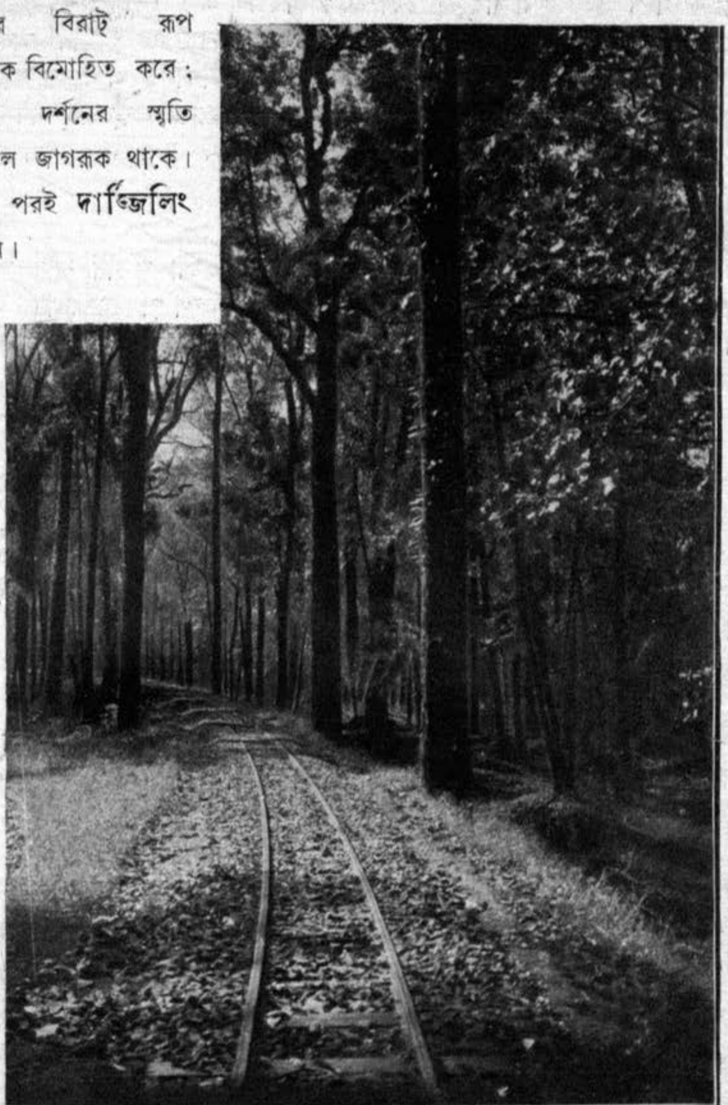
কার্সিয়ং-এর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে এখানে নামিতে হয়। এখানকার পথ ঘাটগুলি পরম রমণীয়। পাঙ্খাবাড়ী রোড, কার্ট রোড, ডাউ হিল রোড, প্রভৃতি রাস্তাগুলি অতিশয় মনোরম। এখানকার ঈগলস্ ক্র্যাগ (Eagle Crag) নামক পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলে একদিকে বিস্তৃত সমতল ভূমি, অপর দিকে তুষার কিরীট-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ শ্রেণী সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোড়া ও ডাণ্ডি স্টেশনেই পাওয়া যায়, এজন্য যাত্রীদের চলাফেরারও সুবিধা রহিয়াছে।

কার্সিয়ং স্টেশন ছাড়িবার কিছু পরেই ট্রেণ হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাব্রু ও জন্নু র তুষার মণ্ডিত শ্বেত শিখর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর শিলিগুড়ি হইতে ৩৭ মাইল দূরবর্ত্তী **টুঙ** স্টেশন পড়ে; সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ইহা ৫,৬৫৬ ফুট উচ্চ। এতক্ষণে গাছ পালা ও জঙ্গলের রূপ সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে।

টুঙ ছাড়িবার কিছু পরেই দক্ষিণে কার্সিয়ং শহর সুন্দর ভাবে দেখা যায়। তাহার পর পশ্চিমে ইংরেজী ধরণের বাড়ী ঘর ও গির্জ্জা-সম্পন্ন হোপ টাউন নামক একটি ক্ষুদ্র ইউরোপীয় বসতি ফেলিয়া ভিক্টোরিয়া ভাটিখানা ছাড়াইয়া শিলিগুড়ি হইতে ৪২ মাইল দূরবর্ত্তী **সোনাদা** পড়িবে। ইহা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৬,৫৫২ ফুট উচ্চ। ভাটিখানা স্টেশন হইতে আধ মাইল নীচে এবং হোপ টাউনে ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপন বিশেষ সফল হয় নাই। লেপ্চা ভাষায় সোনাদার অর্থ ভল্লুকের গুহা; এককালে এ অঞ্চলে ভল্লুকের বিশেষ উৎপাত ছিল এবং এখনও এখানে ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়।

সোনাদার পর গভীর রিজার্ভ জঙ্গল পার হইয়া সুউচ্চ সিঞ্চল পাহাড়ের পাদদেশে ঘুম বাজারের মধ্য দিয়া শিলিগুড়ি হইতে ৪৮ মাইল দূরবর্ত্তী **ঘুম** স্টেশন। ইহা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৭,৪০৭ ফুট উচ্চ এবং এই রেলপথে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ

স্থান। পরবর্ত্তী স্টেশন দার্জ্জিলিং যাইতে রেলপথ কিছু নামিয়া গিয়াছে। ঘুম স্টেশন ছাড়িয়া বাতাসিয়া বা শেষ চক্রটি পার হইবার সময় তুষারাচ্ছন্ন কাঞ্চনজঙ্ঘার বিরাট্ রূপ দর্শককে বিমোহিত করে; প্রথম দর্শনের স্মৃতি চিরকাল জাগরূক থাকে। ইহার পরই **দার্জ্জিলিং** স্টেশন।



দার্জ্জিলিংএর পথে শালবনের দৃশ্য

**দার্জ্জিলিং**—ইহা শিলিগুড়ি হইতে ৬১ মাইল ও কলিকাতা হইতে ৩৬৯ মাইল দূরে অবস্থিত। ভারতবর্ষে যতগুলি পার্ব্বত্য নগরী আছে তাহার মধ্যে দার্জ্জিলিং

সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এজন্য ইহার নাম পার্ব্বত্য নগরীর রাণী (Queen of the Hill Stations), সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৬,৮১২ফুট উচ্চ। এখান হইতে তুষার-মণ্ডিত বিস্তৃত শৈলশ্রেণী যেমন সুন্দর দেখা যায় ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর আর কোনও পার্ব্বত্য নগরী হইতে তেমন দেখা যায় না। সুবিশাল কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অবর্ণনীয়। জলাশয় বা নদী থাকার জন্য শ্রীনগর, নৈনিতাল, শিলং ও উটাকামণ্ড্ অনেকের মনোরঞ্জন করে বটে, কিন্তু চিরহরিৎবর্ণ ঘনপল্লব বিটপীমণ্ডিত পর্ব্বতরাজিবেষ্টিত সুমহান্ কাঞ্চনজঙ্ঘার বহুবিস্তৃত ও চিরশুভ্র শিখরমালা দার্জ্জিলিং হইতে যে ভাবে দেখা যায় সারা দুনিয়ায় তাহার তুলনা নাই।

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গগুলির মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেও এত উচ্চ পর্ব্বত শিখর এমন মুক্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীর কোনও পার্ব্বত্য নগরী হইতে দৃষ্ট হয় না। মুসৌরী, সিমলা, ড্যালহৌসী বা মারী প্রভৃতি স্থানে এমন দুর্ভেদ্য ঘন এবং নয়নাভিরাম অরণ্যানী নাই।

কার্সিয়ংএর মত দার্জ্জিলিংও পূর্ব্বে সিকিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা প্রথম দার্জ্জিলিং-এ আসেন এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে সিকিমরাজ বার্ষিক ৬০০০৲ টাকা খাজনা পাইয়া দার্জ্জিলিং পাহাড় ইংরেজ সরকারকে ছাড়িয়া দেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কার্সিয়ংএর নীচে পাঙ্খাবাড়ী হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত একটি রাস্তা তৈয়ারী হয়। সিকিমরাজ যে খাজনা পাইতেন তাহা দুই জন ইংরেজকে বন্দী করিবার অপরাধে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দার্জ্জিলিং এখন বাংলার লাট সাহেবের গ্রীষ্মনিবাস।

দার্জ্জিলিং শহরটি অর্দ্ধবৃত্তাকারে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এখানকার বাড়ীগুলি অধিকাংশ কাঠের এবং দরজাগুলি কাচের সার্শি দিয়া আঁটা।

দার্জ্জিলিং শহরের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ অংশের নাম কাটাপাহাড়; তাহার নীচেই জলাপাহাড়। ইহার উপর গোরা বারিক অবস্থিত এবং জলাপাহাড়ের উপর ইংরেজ সৈন্য-দিগের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস অবস্থিত। এই পাহাড়ের উপরিস্থ জঙ্গল আগুনে জ্বলিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া জলাপাহাড় নাম হইয়াছে।

শহরের মধ্যস্থলে 'অব্জরভেটরী হিল' নামক পাহাড়ও বেশ উচ্চ। পূর্ব্বে এখানে একটি মান মন্দির ছিল বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে অব্জরভেটরী পাহাড়। ইহার শিখরদেশে আরোহণ করিলে গিরি সম্রাট্ কাঞ্চনজঙ্ঘা ও পার্শ্ববর্ত্তী তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বত-শৃঙ্গগুলি অতি মনোরম দেখায়। পূর্ব্বদিকে দার্জ্জিলিং শহরটিও এখান হইতে সুন্দর দেখায়। পরিষ্কার দিনে এখান হইতে কালিম্পং শহরও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ রাত্রিতে দূর হইতে কালিম্পং-এর আলোকমালা বিচিত্র ও রমণীয় মনে হয়।

কিংবদন্তী আছে যে অবজরভেটরী পাহাড়ের উপর দুর্জ্জয়লিঙ্গ নামে এক মহাদেবের মন্দির ছিল; এখন দুর্জ্জয়লিঙ্গ পাহাড়ের একটি গহ্বরে বিরাজ করিতেছেন। তথায় প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। দার্জ্জিলিং নামের উৎপত্তি দুর্জ্জয়লিঙ্গ হইতে হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। পূর্ব্বে তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের এখানে একটি মঠ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নেপালীরা এঅঞ্চল জয় করার সময় মঠটি বিনষ্ট করে; এই মঠ সিকিমের প্রসিদ্ধ দার্জ্জিলিং মঠের শাখা ছিল। পুরাতন স্থানেই পাহাড়ের গুহার উপরে মঠটি পুনর্নিম্মিত করা হয়; কিন্তু পরে উহাকে অবজরভেটরী পাহাড়ের নীচে ভুটিয়া বস্তীতে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। মঠের পুরাতন স্থানটি এখনও পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়;



দার্জ্জিলিং শহরের দৃশ্য

তথায় ভুটিয়াদের ক্ষুদ্র একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি বৃহৎ প্রোথিত বংশদণ্ডে নানা মাপের বহু রঙীন নিশান ঝুলানো আছে। লোকের বিশ্বাস নিকটস্থ গুহাটি মাটির নীচ দিয়া বরাবর লাসা পর্য্যন্ত গিয়াছে। পাহাড়ের উপর পূর্ব্বে যে বৌদ্ধ মঠটি ছিল, তাহাকে "দোর্জে" বলা হইত; তিব্বতী ভাষায় দোর্জের অর্থ বজ্র; কেহ কেহ বলেন দোর্জের স্থান হইতে দার্জ্জিলিং নামের উৎপত্তি।

অব্জরভেটরী পাহাড়ের নীচে চারিদিক্ ঘিরিয়া ম্যাল্রোড্; ইহাই দার্জ্জিলিংএর প্রধান বেড়াইবার রাস্তা। যাঁহারা দূরে বেড়াইতে চাহেন তাঁহারা অক্ল্যাণ্ড রোড্ বা জলাপাহাড় রোড দিয়া ঘুম পর্য্যন্ত যাইতে পারেন।

ম্যালের নীচে অবস্থিত ভূটিয়া বস্তির বৌদ্ধ মঠ বা গোম্ফা দেখিয়া আসা উচিত। ইহা একটি সাধারণ দ্বিতল বাটী; ইহার চারিদিকে লম্বা লম্বা খুঁটী পুতিয়া দড়ি দিয়া বহু নিশান ঝুলানো আছে। প্রবেশ দ্বারের দুই পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ধর্মচক্র আছে। ভিতরে বুদ্ধমূর্ত্তি, নানারূপ পূজার উপকরণ এবং বৌদ্ধ পুঁথির সংগ্রহ আছে। গোম্ফার উপরে রাস্তার ধারে জনৈক মৃত লামার স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত একটী চৈত্য আছে।

অব্জরভেটরী পাহাড়ের নীচে ম্যালরোডের এক কোণে বাংলার লাটের প্রাসাদ ও বার্চহিল পার্ক নামক সুন্দর স্বাভাবিক উদ্যান। এইখানে দাৰ্জ্জিলিংএর পুরাতন জঙ্গল কিছু রক্ষিত হইয়াছে। বার্চহিল হইতে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য অতীব মনোরম। বার্চহিল পার্কের নীচে দাৰ্জ্জিলিংএর যাদুঘর, এই যাদুঘরে দাৰ্জ্জিলিং জেলার অনেক জীবজন্তু এবং সকল রকম প্রজাপতি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

এখানকার আর একটি দর্শনীয় স্থান লয়েড বোটানিক্যাল গার্ডেন। মানুষের হাতে তৈয়ারী ৪২ বিঘা জমি জুড়িয়া এই উদ্যানটির সহিত বার্চহিলের স্বাভাবিক উদ্যানের পার্থক্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানকার গ্রীন হাউসে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর অর্কিড দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। এখান হইতে আধ মাইল দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া জল-প্রপাত। কাগঝোরা নামে একটি ছোট পাৰ্ব্বত্য নদী এখানে হঠাৎ প্রায় ১০০ ফুট নীচে গিয়া পড়িয়াছে।

বোটানিক গার্ডেনের উপরে দাৰ্জ্জিলিংএর বাজারে বহু জাতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়। রবিবারে হাটের দিন ফল সব্জী প্রভৃতি জিনিষের আমদানি হয় এবং বহু দূর হইতে বহু লোক হাটে আসিয়া থাকে।

জলাপাহাড় রোড দিয়া কলিকাতা রোড ধরিয়া মাইল দুই যাইলে ভুটিয়াদের পুরাতন কবরস্থান দেখিতে পাওয়া যায়; এখানে বহু সমাধি চৈত্য আছে। এই রাস্তা হইতে পৰ্ব্বত ও উপত্যকার দৃশ্য সত্যই উপভোগ্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ ছোট গল্প "দুরাশা"র নবাবজাদীকে পাঠক পাঠিকার স্মরণ থাকিবে; তাঁহাকে দাৰ্জ্জিলিংএর এই ক্যালকাটা রোডেই "দেখিতে" পাওয়া গিয়াছিল।

শিলিগুড়ি হইতে দাৰ্জ্জিলিং পর্য্যন্ত কার্টরোড নামে যে পাকা রাস্তা আছে তাহা দাৰ্জ্জিলিং অতিক্রম করিয়া উত্তরে নামিয়া গিয়া প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী আলিবং বা লেবং পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহাও বেড়াইবার পক্ষে সুন্দর রাস্তা, সম্মুখে হিমালয়ের চিরতুষার ও উপত্যকা ও স্রোতস্বিনী গুলি ইহাকে মনোরম করিয়াছে। লেবং যাইবার আর একটি রাস্তা ভূটিয়া বস্তীর মধ্য দিয়া গিয়াছে; এ রাস্তায় চড়াই পড়ে, কিন্তু দূর মোটে দুই মাইল। লেবংএ এ অঞ্চলের আর একটি গোরা বারিক আছে এবং এখানকার সমতলমাঠে দাৰ্জ্জিলিংএর ঘোড় দৌড় হয়। আলিবং কথাটির উৎপত্তি লেপ্‌চা ভাষার "আলি" অর্থে জিহবা ও "আবং" অর্থে মুখ হইতে। আলিবং হইতেই ইংরেজীতে লেবং হইয়াছে। বাস্তবিক লেবংকে দেখিলে মনে হয় ইহা যেন দাৰ্জ্জিলিং পাহাড় হইতে জিহ্বার ন্যায় মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। লেবং হইতে উত্তরে ছয় মাইল আরও নামিয়া সমুদ্র

পৃষ্ঠ হইতে ৪,০০০ ফুট উচ্চ বাদামতম ডাকবাংলা হইতে দুই হাজার ফুট নীচে অবস্থিত গ্রেট রঙ্গীত নামক নদীর দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। নদী পর্য্যন্ত নামিতে আরও তিন মাইল পথ।

দার্জ্জিলিং হইতে যে সকল উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে সম্মুখেই মাত্র ৪৫ মাইল দূরবর্ত্তী কাঞ্চনজঙ্ঘা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮,১৪৬ ফুট উচ্চ। কাঞ্চনজঙ্ঘা কথাটি তিব্বতী কাং-ছেন-দ্জোং-গা হইতে আসিয়াছে; ইহার শাব্দিক অনুবাদ হইল বরফ-বড়-খাজাঞ্চিখানা-পাঁচ। পাহাড়টির পাঁচটি শিখর হইতে এইরূপ নাম হইয়াছে। উচ্চতম শিখরটি সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় সোণার রং ধারণ করে বলিয়া ইহাকে সোণার খাজাঞ্চিখানা বলা হয়; দক্ষিণের শিখরটি সূর্য্যোদয়ের আগে পর্য্যন্ত ধূসরবর্ণ থাকে এবং সূর্য্য উঠিলে রূপার মত ঝক্ ঝক্ করে বলিয়া ইহাকে বলে রূপার খাজাঞ্চিখানা; বাকী শিখরগুলিকে রত্ন, শস্য ও শাস্ত্রের খাজাঞ্চিখানা বলা হয়; তিব্বতীয়দের নিকট এইগুলিই পার্থিব সম্পত্তির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চিমে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪,৩১৫ ফুট উচ্চ কাব্রু এবং ২৫,৩০০ ফুট উচ্চ জানো বা কুম্ভকর্ণ; কাব্রু দেখিতে দুই খুঁটি-ওয়ালা তাঁবুর মত এবং জন্নু দেখিতে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গের ন্যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘার পূর্ব্বদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২,০২০ ফুট উচ্চ পানদিম; ইহার অর্থ রাজমন্ত্রী—পর্ব্বতরাজ কাঞ্চনজঙ্ঘার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। পানদিমের পূর্ব্বে তুষারাবৃত পর্ব্বতশ্রেণী লম্বা চলিয়া গিয়াছে; ইহার মধ্যে প্রধান মোচারমত দেখিতে নরসিং ১৮,১৪৫ ফুট উচ্চ, সিনিওল্চু ২২,৫২০ ফুট উচ্চ এবং টেবিলের পৃষ্ঠের ন্যায় শিখরযুক্ত কিন্‌চিনঝাউ ২২,৭২০ ফুট উচ্চ। তিব্বতী ভাষায় কিন্‌চিনঝাউ অর্থে শ্মশ্রুধারী বৃহৎ বরফের শিখর, পর্ব্বতগাত্র হইতে লম্বমান তুষারপিণ্ডগুলি দেখিতে শ্মশ্রুর মত বলিয়াই ইহার এইরূপ নাম।

অজেয় এভারেস্টের তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিতে এ পর্য্যন্ত যত অভিযানকারীর দল আসিয়াছেন, তাঁহাদের বেশীর ভাগই দার্জ্জিলিংএ আসিয়া রসদ ও কুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাদের সকলেই আজ পর্য্যন্ত বিফল হইয়াছেন এবং ম্যালোরী, আর্ভিন্ প্রভৃতি এই বীরোচিত কার্য্যে অগ্রসর হইয়া মৃত্যু বরণ করিয়া অপরাজেয় মানবাত্মার অন্তহীন উদ্যমের সাক্ষ্য দিতেছেন। ভারতবাসী হিমালয়কে সত্যই বলিতে পারেন

তুমি ভারতের সাক্ষী তুমি তার গৌরব পতাকা,
যত গর্ব্ব যত বীর্য্য সবই তার তব অঙ্গে লিখা।

দার্জ্জিলিং-এ রামকৃষ্ণ আশ্রম, গৌড়ীয় মঠ, ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আছে। এখানকার সেন্ট এণ্ড্রুজ গির্জ্জায় ভারতবর্ষের প্রথম ভাইস্‌রীন লেডী ক্যানিংএর সম্মানে একটি স্মৃতি ফলক আছে; তরাইএ স্বাভাবিক দৃশ্যের ছবি আঁকিবার সময় জ্বরে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। বারাকপুরে ইহার সমাধির কথা আগে বলা হইয়াছে। এখানকার বিলাতি হোটেলগুলির মধ্যে মাউণ্ট এভারেস্ট হোটেল, বেলভিউ হোটেল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। অন্যান্য পার্ব্বত্য নগরী অপেক্ষা বাঙালী ও ভারতবাসীদের পক্ষে দার্জ্জিলিংএ

থাকিবার অনেক সুবিধা আছে। দেশীয় হোটেল প্রভৃতির মধ্যে সেণ্ট্রাল বোর্ডিং একেবারে স্টেশনের নিকটে অবস্থিত। বাজার হইতে অল্প একটু দূরে রেল স্টেশনের নিকটে কার্টরোডের উপর লাউইস্ জুবিলি স্যানিটেরিয়াম্। ইডেন স্যানিটেরিয়াম্ যেরূপ কেবল ইউরোপীয়দের জন্য, এইটি সেইরূপ কেবল ভারতবাসীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। প্রতি বৎসর বিজয়ার দিন এখানে শহরের সমস্ত বাঙালীরা মিলিত হইয়া ক্রীড়া কৌতুক ও আনন্দের ভিতর দিয়া সময় অতিবাহিত করেন। রেল স্টেশনের কাছেই ধর্ম্মশালা; ধর্ম্মশালায় থাকিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আহারাদির ব্যবস্থা নিজেদের করিতে হয়। নিরামিষ-ভোজীদের পক্ষে এই ত্রিতল ধর্ম্মশালাটি খুবই সুবিধাজনক। মাড়োয়ারীরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই ত্রিতল ধর্ম্মশালাটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বাংলাদেশের মধ্যে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ও নিকটবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে বহু লোক আসিয়া থাকেন।

দার্জ্জিলিংএ দুইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। একটি গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুল, অপরটি বাঙালী বালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত মহারাণী স্কুল। ইহার সংলগ্ন বোর্ডিংএ প্রবাসী বালিকাদের থাকিবার সুবন্দোবস্ত আছে। কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ ও বর্দ্ধমানের মহারাণী— এই তিন জন মহারাণীর চেষ্টা ও যত্নে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম "মহারাণী স্কুল।" ইহা ছাড়া ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী বালক বালিকাদিগের জন্য ভালো স্কুল আছে।

দার্জ্জিলিং শহরের "ষ্টেপ এসাইড" নামক বাড়ীতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়। তাহার জন্যও বাঙালীর নিকট ইহা স্মরণীয় স্থান।

এই শহরের জন সংখ্যা আনুমানিক ২৮,০০০। ইহার এক পঞ্চমাংশ বাঙালী। পার্ব্বত্য অধিবাসীরা তিনটি বিভিন্ন জাতির; পাহাড়িয়া বা নেপালী, ভুটিয়া ও লেপচা। ইহাদের মধ্যে পাহাড়িয়াগণ দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।

দার্জ্জিলিং চা আবাদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দার্জ্জিলিংএর চা সুগন্ধির জন্য বিখ্যাত। সমগ্র জেলায় প্রতি বৎসর গড়ে ২১,০০০,০০০ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়।

**দার্জ্জিলিংএর আশে পাশে**—দার্জ্জিলিংএর আগের স্টেশন ঘুম হইতে সুন্দর জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা দিয়া দুই মাইল চড়াই উঠিয়া সিঞ্চল পাহাড়ের উপরিস্থিত ডাক-বাংলা। ইহা উচ্চে ৮,১৬৩ ফুট। পূর্ব্বে এখানে গোরা বারিক ছিল। উহা জলা-পাহাড়ে লইয়া যাওয়া হয়। এখন ইহা গলফ খেলার মাঠ হইয়াছে। সিঞ্চল হইতে আরও এক মাইল উঠিয়া টাইগারহিল বা বাঘ পাহাড়ের উপরে যাইতে হয়। সিঞ্চল ও বিশেষতঃ টাইগার হিল হইতে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী যেরূপ অপূর্ব্ব সুন্দর দেখায় দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী আর কোথা হইতে তাহার তুলনা হয় না। দক্ষিণে কার্সিয়ং পাহাড় ও বাংলার সমতল ভূমি ও তরাইএর মধ্য দিয়া তিস্তা, বালাসন, মহানদী ও মেচী যেন মানচিত্রে আঁকা রহিয়াছে। উত্তরে ঠিক সিঞ্চলের নীচে ৭০০০ ফুট নিম্নে

অবস্থিত রঙ্গীত নদীর গভীর উপত্যকা; রঙ্গীত গিয়া তিস্তাতে মিশিয়াছে। তিস্তার ওপারে সিকিম, নেপাল ও ভূটানের পাহাড় শ্রেণীর পর শ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাদের উপরে অর্দ্ধ দিগ্‌মণ্ডল ব্যাপিয়া জাগিয়া আছে তুষারাবৃত শিখরের পর শিখর। কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাব্রু, জানো, পান্‌দিম্, নরসিং প্রভৃতির দৃশ্য এখান হইতে আরও সুন্দর, আরও মহান্। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তুষারাচ্ছন্ন চোঙ্গাশ্রেণীর পশ্চাতে ৪ মাইল দূরে তিব্বতের চুমূলহারি পর্ব্বত (২৩,৯২৯ ফুট) বৃহৎ গোলাকার তুষারস্তূপ রূপে দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম কোণে সিঙ্গলীলার কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতশ্রেণীর উপর দিয়া শত মাইল দূরে জগতের উচ্চতম পর্ব্বতশিখর ২৯,০০২ ফুট উচ্চ এভারেস্টের শীর্ষদেশটুকু অপর দুইটি পর্ব্বতশৃঙ্গের মধ্যস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্ত্তী দুইটির মধ্যে ২৭,৭৯৯ ফুট উচ্চ আরাম-কেদারার মত দেখিতে মাকালুকে, অনেক নিকটে অবস্থিত বলিয়া এভারেস্ট অপেক্ষা বড় বলিয়া ভ্রম হয়। টাইগার হিল হইতে চিরতুষার-হিমালয়ের গাত্রে সূর্য্যোদয় দেখিতে পাওয়া জীবনের এক দুর্ল্লভ অভিজ্ঞতা। উদীয়মান্ সূর্য্যের আলোকচ্ছটায় বরফের গায়ে পর



দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী একটি সুন্দর দৃশ্য

পর কত রং যে ফলিত হয় তাহা ভাষার দ্বারা বুঝান যায় না। রাত্রি থাকিতে দার্জ্জিলিং হইতে পদব্রজে, অশ্বপৃষ্ঠে বা রিক্‌শা আরোহণে সহজেই সূর্য্যোদয় দেখিয়া আসা যায়। অনেকে সিঞ্চল ডাকবাংলায় আসিয়া রাত্রি যাপন করেন এবং প্রত্যূষে উঠিয়া টাইগার হিলে চলিয়া যান। উত্তর-পশ্চিম সিঞ্চলের গাত্রে দার্জ্জিলিংএর জল সরবরাহের কারখানা! পাহাড়ের গা হইতে জল ধরিয়া থিতাইবার জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট পুষ্করিণী আছে।

ঘুম গ্রামটি তিনটি প্রধান রাস্তার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। একটি শিলিগুড়ি হইতে কার্ট রোড, দ্বিতীয়টি পশ্চিমে নেপাল সীমান্তে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী সীমানাবস্তি পর্য্যন্ত এবং তৃতীয়টি পূর্ব্বদিকে তিস্তা উপত্যকা হইয়া কালিম্পং পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে তিব্বত গিয়াছে।

ঘুম হইতে পশ্চিমে সীমানাবস্তির রাস্তা ধরিয়া ৪ মাইল গেলে ১০০ ফুট উচ্চ একটি প্রকাণ্ড বিচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের ইহা একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। ইহার উপর হইতে পশ্চিমে বালাসন উপত্যকার দৃশ্য অতি চমৎকার। কথিত আছে, বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদিগকে এই পাথরের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া সংহার করা হইত।

এই রাস্তা ধরিয়া আরও তিন মাইল যাইয়া ঘুম হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী **সুকিয়া-পোখরী** গ্রাম। এখানে প্রত্যেক শুক্রবার একটি বড় হাট বসিয়া থাকে। এই হাটে নেপাল হইতে অনেক মাল আমদানী হয়। ইহার পরে পথ ঘন জঙ্গলমধ্য দিয়া উঠিয়া ১ মাইল দূরে জোড়াপোখ্‌রী ডাকবাংলায় পৌঁছায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৪০০ ফুট উচ্চ অরণ্যমধ্যে এই ডাকবাংলাটির অবস্থান ছবির মত। তিন মাইল পরের নেপাল সীমানায় অবস্থিত সীমানাবস্তি গ্রাম ও বাজার। ইহার কিছু অংশ নেপাল রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরে রাস্তা ছোট হইয়া উত্তরদিকে সীমান্ত ধরিয়া গিয়াছে। এই পথে শুধু অশ্বপৃষ্ঠে বা পায়ে হাঁটিয়া চলা যায়।

এই পথ দিয়া ৯ মাইল যাইলে ঘুম হইতে ১৯ মাইল দূরবর্ত্তী তংলু বা তুমলিং ডাকবাংলা। নেপাল সীমান্তের নিকটেই ইহা অবস্থিত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১,০৭৪ ফুট উচ্চ। এখান হইতেও সম্মুখে কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর পূর্ব্বে দংকিয়া (২৩,১৭৬ ফুট) ও চুমুলহারি পর্ব্বতের তুঙ্গ শিখর ও তুষারপুষ্ট তিস্তা নদী, পশ্চিমে নেপালের উপত্যকাগুলি ও কোশী নদী ও দক্ষিণে উত্তরবঙ্গের সমতল ভূমি প্রভৃতির দৃশ্য অতি সুন্দর।

রাস্তা ধরিয়া আরও ১৪ মাইল যাইলে ঘুম হইতে ৩৩ মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১১,৯২৯ ফুট উচ্চ **সন্‌দক্‌ফু** ইনস্‌পেকশন বাংলা অবস্থিত; ইহা দার্জ্জিলিং জেলার অন্তর্গত উচ্চতম শিখর সিঙ্গলীলা পর্ব্বতশ্রেণীতে অবস্থিত। হিমালয়ের দৃশ্য এত সুন্দর দার্জ্জিলিং জেলার আর কোথা হইতেও দেখিতে পাওয়া যায় না। ভূটান, সিকিম ও নেপালের তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা প্রায় দুইশত মাইল ব্যাপিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে কাব্রু, জানো ও পান্‌দিম। সম্মুখের বিরাট কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং শত মাইল পশ্চিমদিকে শ্রেণীর পর শ্রেণী পাহাড়ের উপরে বিশাল আরাম কেদারার আকারের মাকালুর পশ্চাতে মহিমান্বিত ও কমনীয় এভারেস্টের তুঙ্গ শিখর। নরসিং, দংকিয়া, চোলা ও চুমুলহারি এই স্থান হইতে আরও ভাল দেখা যায়। তিব্বতী ভাষায় সন্দকফুর অর্থ বিষাক্ত গাছের পাহাড়, কারণ এখানে সেঁকো বিষের গাছ বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

এখান হইতে আরও ৯ মাইল উত্তরে যাইলে ঘুম হইতে ৪৬ মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১১,৮১১ ফুট উচ্চে অবস্থিত ফালুট ইনস্‌পেক্‌শন্ বাংলা; এখান হইতেও

সনদক্‌ফুএর মত দৃশ্যাবলী সম্মুখে বিরাজিত, তবে এভারেস্টকে প্রায়ই দেখা যায় না; কারণ মাকালু দিয়া ঢাকা পড়িয়া যায়। কিন্তু মাত্র ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তাহার নিকটস্থ শিখরগুলি আরও বড় দেখায়। ফালুট কথাটি আসিয়াছে লেপ্‌চা ভাষায় "ফাক-লুট" হইতে, ইহার অর্থ খোলা-ছাড়ানো পাহাড়। এই নামের কারণ, এই পাহাড় শুষ্ক বৃক্ষহীন, কিন্তু ইহার নীচের পাহাড়গুলি ঘন জঙ্গলে পূর্ণ।

দার্জ্জিলিং হইতে একদিনে জোড়পোখ্‌রী, দ্বিতীয় দিনে তংলু বাংলা, তৃতীয় দিনে সনদকফু ও চতুর্থ দিনে ফালুট পৌঁছান যায় এবং আট দিনে দার্জ্জিলিং ফিরিয়া আসা যায়। ফালুট না যাইতে পারিলেও ছয় দিনে সনদকফু একবার দেখিয়া আসা উচিত।

ঘুমের জোড়বাংলা বাজারের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে কালিম্পংএর রাস্তাটি গিয়াছে। রঙ্গরুন জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়া ৬ মাইল পরে রাস্তা সরু হইয়া গিয়াছে এবং বাকী রাস্তাটুকু অশ্বপৃষ্ঠে বা পদব্রজে যাইতে হয়। এখান হইতে আরও ৮ মাইল গিয়া ঘুম হইতে ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী লোপচু বাংলায় পৌঁছান যায়; এখান হইতে রঙ্গীত উপত্যকা, ভূটান পাহাড় ও কালিম্পং সুন্দর দেখা যায়। লোপচু হইতে অরণ্য মধ্যদিয়া ৫ মাইল নামিলে পশোক বাংলা। ইহা ছাড়িয়া অল্প দূর গেলে ২,৫০০ ফুট নিম্নে অবস্থিত রঙ্গীত ও তিস্তার সঙ্গম অতি সুন্দর দেখায়।

লোপচু হইতে কালিম্পংএর রাস্তা ধরিয়া আর মাত্র ৭ মাইল যাইলে তিস্তা নদী দেখা যায়।

ঘুম হইতে তিস্তা তীর পর্য্যন্ত ২১ মাইলে পথটি ৭,০০০ ফুট হইতে ৭০০ ফুটে নামিয়াছে। তিস্তার উপর এই স্থানে একটি সুন্দর ঝুলান সাঁকো আছে; শিলিগুড়ি হইতে কালিম্পং আসিতে হইলেও এই সাঁকো পার হইতে হয়। এই সাঁকো পার হইয়া ভাল গাড়ীর রাস্তায় কালিম্পং ৯॥০ মাইল দূর, কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠে, রিক্‌শাতে বা পদব্রজে সোজা পাহাড়ে রাস্তা দিয়া মাত্র ৭ মাইল পড়ে।

এই সাঁকো হইতে মাত্র ৩ মাইল উত্তরে তিস্তার পশ্চিমকূলে গ্রেট রঙ্গীত নদী আসিয়া মিশিয়াছে। ইহা দার্জ্জিলিং জেলার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ রমণীয় স্থান। অরণ্য-বেষ্টিত দুইটি পার্ব্বত্য নদীর এই সঙ্গম স্থলটি সত্যই অতি মনোরম। লক্ষ্য করিবার বিষয় দুইটি নদীর জলের রং সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিস্তার জল স্ফীত ও দুগ্ধশুভ্র ও রঙ্গীতের জল স্বচ্ছ ও ঘোর সবুজ। এই রংএর পার্থক্য সঙ্গমের পরেও বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। তাহা ছাড়া রঙ্গীতের জল তিস্তার জল অপেক্ষা অনেক উষ্ণ। এই বর্ণ ও তাপের পার্থক্যের কারণ রঙ্গীত প্রধানতঃ নিম্ন হিমালয়ের বারিপাত হইতে পুষ্ট আর তিস্তা উচ্চ হিমালয়ের তুষার ধারা হইতে উদ্ভূত।

দার্জ্জিলিং হইতে লেপচু, পশোক ও কালিম্পং যথাক্রমে ২, ৩ ও ৪ দিনে দেখিয়া ফিরিয়া আসা যায়।

দার্জ্জিলিং হইতে এই সকল ও অন্যান্য স্থান দেখিয়া আসিতে হইলে ডেপুটি কমিশনরের দপ্তর হইতে প্রকাশিত নোটস্ অন্ টুরস্ (Notes on Tours) দ্রষ্টব্য। তাহা ছাড়া ডাকবাংলোর ব্যবস্থা এই দপ্তরেই করিতে হইবে।

**কালিম্পংএর পথে**—শিলিগুড়ি ছাড়িয়া শিলিগুড়ি রোড স্টেশন হইতে তিস্তা উপত্যকা শাখা নির্গত হইয়াছে। শাখাটি প্রথম ১২ মাইল সমতলক্ষেত্র ও অল্প পরেই তরাইএর শালবন দিয়া গিয়াছে, এই বনে ব্যাঘ্র ও বন্য হস্তী আছে। ইহার পর রেলপথ একটি সুন্দর সাঁকো দিয়া সেবক নদী পার হইয়াছে; সাঁকোটি অতিক্রম করিয়াই সেবক তিস্তার সহিত মিশিয়াছে। সেবক নদীর অপর পারে শিলিগুড়ি হইতে ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী এই শাখার প্রথম স্টেশন **সেবক**। ইহার পরেই রেলপথ হঠাৎ তিস্তা উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছে। এই স্থানে তিস্তা পার্ব্বত্যপথে গভীর ও সঙ্কীর্ণ খাদে প্রবাহিত হইয়া সমতল ভূমিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তিস্তা উপত্যকায় প্রবেশ করিলেই দেখা যাইবে যে নিবিড় জঙ্গলাবৃত তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং নিকটেই তিস্তা তর তর করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। শীতকালে নদীর জল যখন সবুজ রং ধারণ করে এবং উপরের ঝুঁকে পড়া লতাপাতার মধ্য হইতে শাদা পাথরগুলি উঁকি দিতে থাকে তখন সত্যই দৃশ্যটি বর্ণ বৈভবে বিচিত্র হইয়া উঠে। বর্ষাকালে জলের রং প্রায় দুধের মত শাদা হইয়া উঠে এবং এত সুন্দর থাকে না; কিন্তু ইহার পরিমাণ ও গতিবেগ অনেক বাড়িয়া যায় এবং কোথাও কোথাও স্রোতের গতি ঘণ্টায় ১৪ মাইল হইয়া উঠে। এইরূপে এই তুঙ্গ ও সঙ্কীর্ণ উপত্যকা দিয়া রেলপথ পর্ব্বত ও জঙ্গল-মধ্য দিয়া গিয়া শিলিগুড়ি হইতে ১৮ মাইল দূরে কালীঝোরা নদীর পুল অতিক্রম করে। নিকটেই কালীঝোরার জলপ্রপাতের দৃশ্য অতি মনোরম; ৫৫০ ফুট উচ্চ পর্ব্বত হইতে কালীঝোরা ঝর ঝর রবে অবতীর্ণ হইয়া রেলপথের পাশেই তিস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানকার দৃশ্য অতি সুন্দর; অনেকে এখানে বনভোজনে ও শিকারে আসেন। কালীঝোরার জল কৃষ্ণাভ বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

কালীঝোরার পর রিয়াং স্টেশন পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তুষারাবৃত পর্ব্বত শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। রিয়াং নদীর পুল পার হইয়া রেলপথ ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা কৌশলে পুলের উপরে রিয়াং স্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছে। **রিয়াং** শিলিগুড়ি হইতে ২৫ মাইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রিয়াং নদী এক রাত্রির মধ্যে পুরাতন খাদ ত্যাগ করিয়া নূতন খাদে বহিতে থাকে। পুরাতন পুলের স্তম্ভগুলি শুষ্ক পাথর ও নুড়ির মাঝে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বকার খাদের সাক্ষ্য দিতেছে।

রিয়াং স্টেশন হইতে মাত্র ৩।৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রিয়াং নদীর উত্তরে অবস্থিত মংপু গ্রাম। দার্জ্জিলিং পথের সোনাদা স্টেশন হইতেও মংপু যাওয়া যায়; সোনাদা হইতে পূর্ব্বদিকে ১১ মাইল দূর এবং মাঝপথে ৫,৬১৫ ফুট উচ্চে অবস্থিত সরাইল বাংলা পড়ে। মংপু বঙ্গের সিন্‌কোনা আবাদের সদর ও প্রধান কেন্দ্র, এই অঞ্চল সিন্‌কোনা চাষের বিশেষ উপযোগী। এখানকার বিভিন্ন আবাদের নাম, রংজো উপত্যকার রাংবী ও মংপু বিভাগ; রিয়াং উপত্যকার সিটং ও লবদা বিভাগ ও কালিম্পংএর উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত দিওলো পাহাড় হইতে পিওং পর্য্যন্ত রংপো উপত্যকার মুনসং বিভাগ। সিন-কোনার চাষ সরকারের একচেটিয়া কারবার। ভারতবর্ষে ইহা কেবল নীলগিরি ও দার্জ্জিলিংএর পাহাড়েই হইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু হইতে চারা ও বীজ আনাইয়া নীলগিরিতেই প্রথম আবাদ সুরু ও সফল হয়। দক্ষিণ আমেরিকার আন্‌ডিজ পার্ব্বত্য অঞ্চলে বনে জঙ্গলে ইহা আপনি জন্মিয়া থাকে। দার্জ্জিলিংএ সিনকোনা চাষের

আরম্ভ হয় ১৮৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে। প্রথমে সিঞ্চল পাহাড়ের শীর্ষ দেশে চারা লাগানো হয়। কিন্তু অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য অচিরেই সাময়িক ভাবে লেবংএ নামাইয়া আনা হয় এবং শেষে দার্জ্জিলিং হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে রংবীতে স্থায়ীভাবে চাষ আরম্ভ হয়। সিনকোনা চাষ অত্যন্ত যত্নসাপেক্ষ। মংপুতে সিনকোনা গাছের শুক্না ছাল রাখিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুদাম আছে; সকল আবাদগুলি হইতে ছাল আনিয়া মংপুর কারখানায় কুইনাইন প্রস্তুত করা হয়। প্রথমে ছালগুলি মিহি করিয়া গুঁড়া করিয়া অতি সূক্ষ্ম রেশমের ছাঁক্‌নী দিয়া ছাঁকিয়া কষ্টিক্ সোডা ও জলের সহিত মিশাইয়া আলোড়ন করা হয়; ইহাতে ছাল হইতে কুইনাইন বাহির হইয়া আসে। ইহার পর ইহাতে তেল ঢালিয়া নাড়িতে থাকিলে কুইনাইন তেলের মধ্যে চলিয়া আসে এবং গুলিয়া যায় এবং নীচে জলের মধ্যে ছালের অবশিষ্ট অংশ পড়িয়া থাকে। উপরের তেল ঢালিয়া লইয়া সারি সারি চৌবাচ্চার মধ্যে রাখিয়া সালফিউরিক এসিড্ মিশ্রিত করা হয়; ইহাতে কুইনাইন সালফেট্ তৈয়ারী হয় এবং তেল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নীচে পড়িয়া যায়; উপর হইতে তেলটুকু পুনর্ব্যবহারের জন্য পৃথক করিয়া লওয়া হয়। এসিড-পূর্ণ নীচের অংশটি অপর একটি পাত্রে লইয়া গিয়া কস্‌টিক সোডা দিয়া অতিরিক্ত এসিডের ভাগ দূর করা হয়; তখন কুইনাইন সালফেট্ দানা বাঁধিয়া উঠে; দানাগুলি ছাঁকিয়া লইয়া গরমজলে পুনরায় গুলিয়া অপর এক প্রক্রিয়া দ্বারা ইহা হইতে রং প্রভৃতি দূর করিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। কুইনাইন সালফেট মিশ্রিত জল ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা করিতে দিলে পুনরায় দানা বাহির হইয়া আসে। সেনট্রিফিউগাল যন্ত্রের সাহায্যে দানাগুলি হইতে শেষ বিন্দু জল বাহির করিয়া লইয়া একটি উষ্ণ কক্ষে এগুলি শুকাইয়া কাগজের মোড়ক করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে পেরুর তদানীন্তন স্পেনীয় রাজ প্রতিনিধির পত্নী কাউনটেস চিন্‌চিন (Chinchon) সিনকোনা ছাল ব্যবহার করিয়া জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করেন। তাঁহার নাম হইতেই সিনকোনা নামের উৎপত্তি, নহিলে প্রথমে ইহা "পেরুভিয়ন বার্ক" বা পেরুদেশীয় ছাল নামে পরিচিত ছিল। কুইনাইন কথার উৎপত্তি পেরুর ইণ্ডিয়ানদিগের ভাষার শব্দ "কিনা" হইতে; কিনা অর্থে গাছের ছাল বুঝায়।

এবার পুনরায় রেলপথে ফিরিয়া রিয়াং স্টেশন হইতে কালিম্পংএর দিকে অগ্রসর হওয়া যাক। রিয়াং স্টেশনের কাছে এবং স্টেশন ছাড়িবার অব্যবহিত পরেই নদীর দৃশ্য অপূর্ব্ব মনোরম হইয়া উঠে। তিস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুতগতিতে বহিয়া চলিয়াছে, নদীর বাঁকে বাঁকে শুভ্র বালুকারাশি ও চক্‌চকে পাথর ও নুড়ির স্তূপ এবং চারিদিকে সুউচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। সবগুলি মিলিয়া নিঁখুত একটি দৃশ্যপট রচনা করিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া রেলপথ চলিয়াছে, কখনও প্রায় ১০০ ফুট নীচে প্রবাহিত তিস্তার একেবারে উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, কখনও বা একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে। দৃশ্য গুলি ক্রমেই সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইয়া উঠিতেছে। ইহার পর এই শাখাপথের শেষ স্টেশন শিলিগুড়ি হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী গিয়েলখোলা আসিবে।

গিয়েলখোলা হইতে ২ মাইল উত্তরে তিস্তার উপর ঝুলান সাঁকো। সাঁকোটি দেখিতে সুন্দর এবং নদীর অনেক উপরে নির্ম্মিত; প্রায় ১০০ ফুট নীচে প্রচণ্ডবেগে তিস্তা বহিয়া চলিয়াছে। এখানে তিনটি প্রধান রাস্তা মিলিয়াছে; শিলিগুড়ি থেকে রেলপথের

সমান্তরালে আসিয়াছে তিস্তা-উপত্যকা রাস্তা; কালিম্পং রাস্তা কালিম্পং হইয়া সিকিম তিব্বত ও ভূটান পর্য্যন্ত গিয়াছে; তৃতীয়টি পাশোক রাস্তা ঘুম ও দার্জ্জিলিং গিয়াছে। এতগুলি রাস্তা আসায়, সাঁকোর কাছেই নদীর পশ্চিম কূলে একটি ছোটো গঞ্জ গড়িয়া উঠিয়াছে; স্থানটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। ইহারই ৩ মাইল উত্তরে দার্জ্জিলিং জেলার একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান রঙ্গীত ও তিস্তার সঙ্গম; ইহার কথা আগেই লেখা হইয়াছে।

সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৭০০ ফুট উচ্চ তিস্তা সাঁকো পার হইয়া মোটরের রাস্তা দিয়া কালিম্পং সাড়ে নয় মাইল উপরে। কিন্তু অনেকেই অশ্বপৃষ্ঠে, রিকশ চড়িয়া কিংবা পদব্রজে একটি সোজাসুজি পাহাড়ে রাস্তা দিয়া কালিম্পং গমন করেন; এই পথে মাত্র ৭ মাইল পড়ে। এই রাস্তা অবশ্য মধ্যে মধ্যে প্রধান মোটর রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে।

**কালিম্পং** সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৩,৯৩৩ ফুট উচ্চ। নগরীর রক্ষীস্বরূপ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে ৫,৫৯০ ফুট উচ্চ দেওলো পাহাড়। উত্তরে সেকেন্দার পর্ব্বতমালার পশ্চাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য তুষারাবৃত শিখরের উপরিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমে গ্রেট রঙ্গীতের শ্যামল উপত্যকা, দক্ষিণ-পশ্চিমে জঙ্গলাকীর্ণ সিঞ্চল পাহাড়, দক্ষিণে বাংলার সমতল ভূমি এবং পূর্ব্বে রিলি নদীর সুন্দর উপত্যকার পশ্চাতে শ্রেণীর পর শ্রেণী নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত পর্ব্বতমালা; এই সকল মিলিয়া কালিম্পংকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের আকর করিয়া তুলিয়াছে।

কালিম্পং শহরে দেখিবার মধ্যে প্রধান হইল বাজারের উপরে সুবৃহৎ গথিক রীতিতে নিৰ্ম্মিত গির্জ্জা। অনতিদূরে তিব্বতীয় রীতিতে নির্ম্মিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তোরণ। ইহার রঞ্জিত ও উজ্জ্বল স্তম্ভ ও কার্ণিসের কারুকার্য্য সিকিম হইতে লামারা আসিয়া খোদাই করিয়াছিলেন। তোরণের মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ব্রোঞ্জমূর্ত্তি। বাজারের নিকটে পর্ব্বতগাত্রে একটি বৌদ্ধ মঠ আছে। উত্তরের দিকে দিওলো পাহাড়ের উপরের অংশে রেভারেণ্ড ডক্টর গ্রেহামের প্রসিদ্ধ সেণ্ট এনড্রুজ কলোনিয়ল হোমজ্ নামক ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী বালক বালিকাদিগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪,৫০০ হইতে ৫,৫০০ ফুট উচ্চে ৪০০ একর জমি লইয়া এই প্রতিষ্ঠানের বিদ্যালয়, কৃষিক্ষেত্র, কারখানা প্রভৃতি অবস্থিত। দিওলো পাহাড়ের নীচের দিকে পিডংএর পথে বাজার হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে ভূটানের প্রধান মন্ত্রী রাজা উগ্যেন্ দোরজি নিৰ্ম্মিত একটি অট্টালিকা আছে। চীন সরকারের শাসন হইতে পলাইয়া আসিয়া দলাই লামা একবার ইহাতে ৪৷৷০ মাস বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহৃত একটি ঘর সম্ভ্রমের সহিত পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা এখানকার একটি দেখিবার জিনিষ।

৪০১ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া তিস্তার পূর্ব্বকূলে অবস্থিত কালিম্পং গভর্ণমেণ্ট স্টেট্ ও তিস্তা জঙ্গল বিভাগের সদর এই কালিম্পং শহর। ইহা একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র। সিকিম ও তিব্বতের বাণিজ্য কালিম্পং দিয়া প্রসার লাভ করিয়াছে। তিব্বত হইতে বহু পরিমাণে পশম অশ্বপৃষ্ঠে আনীত হয়। সিকিমী, তিব্বতী, নেপালী, ভূটানী ও চৈনিক প্রভৃতি নানা জাতীর লোক ব্যবসায়সূত্রে এখানে মিলিত হইয়াছেন। শনি ও বুধবার একবার হাটে ঘুরিয়া আসিলে এইরূপ বহু জাতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

মনে হয় এখানকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া যেন মধ্য-এশিয়ার। এখানে প্রতিবৎসর নবেম্বর মাসে একটি বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। নেপাল, সিকিম, ভূটান ও তিব্বত হইতে বহু ব্যবসায়ী এই মেলায় যোগদান করে। এ অঞ্চলের ইহা একটি বিশিষ্ট বাৎসরিক অনুষ্ঠান। এখানে বৃষ্টি ও শীতের প্রকোপ দার্জ্জিলিং অপেক্ষা অনেক কম।

কালিম্পং হইতে সিকিম ও তিব্বতের পথ বাহির হইয়াছে। দার্জ্জিলিংএর ডেপুটি কমিশনারের অফিস হইতে প্রকাশিত "নোটস্ অন্ টুরজ্"এর কথা আগেই বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত পার্সী ব্রাউন্ রচিত "টুরজ্ ইন্ সিকিম" দ্রষ্টব্য। ডাকবাংলা, ছাড়পত্র, কুলী প্রভৃতির ব্যবস্থা আগে হইতে করিতে হইবে। দার্জ্জিলিংএর ডেপুটি কমিশনারের অফিস্ হইতে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য জানা যাইবে।



মহারাজার গোম্ফা, গংটক

সিকিমের রাজধানী গংটকে যাইবার দুইটি পথ আছে। প্রধান পথ হইতেছে তিস্তা উপত্যকার রাস্তা ধরিয়া। কালিম্পং ছাড়িয়া প্রথম দিনে রংপো ডাকবাংলায় যাইতে হয়। সিকিম রোড দিয়া তারকোলা হইয়া তিস্তার তীরে কার্টরোড় দিয়া রংপো ১৩ মাইল। তারকোলা যাইতে পথ খুব নামিয়া গিয়াছে; কেহ কেহ কালিম্পং হইতে কার্টরোড ধরিয়া ২০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রংপো আসেন। দ্বিতীয় দিনে ১০ মাইল দূরে শ্যামডং ও তৃতীয় দিনে আরও ১৪ মাইল পথ যাইয়া গংটক। শ্যামডং ও গংটকের মধ্যে রামটেক মঠ পড়ে।

গংটকে যাইবার দ্বিতীয় রাস্তা কালিম্পং হইতে প্রথম দিন ১২ মাইল দূরে পিডং ডাকবাংলা। দ্বিতীয় দিন ঋষি রংচো ও রোরো নদীর পুল পার হইয়া ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী পাকীয়ংএর সুন্দর বাংলায় পৌছিতে হয়। তৃতীয় দিন ১০ মাইল যাইয়া গংটক। গংটকের দুইটী পথই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। গংটক হইতে তুষারাচ্ছন্ন ও জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বতশ্রেণীর দৃশ্য অতি সুন্দর। কাঞ্চনজঙ্ঘা, পান্‌দিম্, নরসিং ও সিনোলচু ব্যতীত আরও ছোট ছোট অনেক তুষারাচ্ছন্ন গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়। গংটকে দেখিবার মধ্যে মহারাজার প্রাসাদ ও মঠ বা গোম্ফা, চেরীগাছের সারি দেওয়া রিজ নামক

প্রধান রাস্তাটি এবং তদুপরে অবস্থিত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মূর্ত্তি। গোম্ফার ভিতরের দেওয়ালে বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী উজ্জলবর্ণে চিত্রিত আছে। গংটকের রেসিডেনসীর উদ্যানটি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উদ্যানগুলির অন্যতম।

গংটক হইতে নাথুলা গিরিসঙ্কট যাতায়াতে মাত্র ৫ দিন লাগে। প্রথম দিন গংটক হইতে বন্য এবং গম্ভীর দৃশ্যের মধ্য দিয়া ৯ মাইল পথ কার্পোনাং। দ্বিতীয় দিন তথা হইতে কতকগুলি জল প্রপাতের পার্শ্ব দিয়া এবং একটি হ্রদের কূল দিয়া ৯ মাইল দূরবর্ত্তী ও ১২,৬০০ ফুট উচ্চ চঙ্গু বাংলা পৌঁছিতে হয়। তৃতীয় দিন নাথুলা গিরিসঙ্কটে উঠিয়া পুনরায় চঙ্গুতে ফিরিয়া আসা যায়, যাতায়াতে মাত্র ১২ মাইল। নাথুলা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪,৪০০ ফুট উচ্চ; এখান হইতে তিব্বতের নিষিদ্ধ ভূমি বিস্তৃত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। চঙ্গু হইতে চতুর্থদিনে কার্পোনাং এবং পঞ্চমদিনে গংটকে ফিরিয়া আসা যায়।



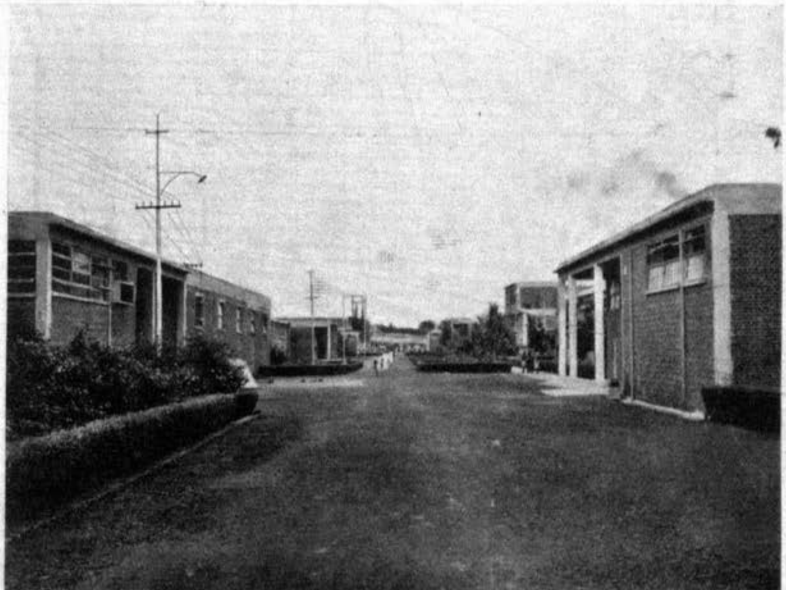
রিজ নামক রাস্তা, গংটক

কালিম্পং হইতে জেলেপলা গিরিসঙ্কটেও সহজেই যাওয়া যায়। প্রথম দিন কালিম্পং হইতে ১২ মাইল দূরে সুন্দর অরণ্যমধ্যের পথ দিয়া রিসিসুম (বিসুম বা রিকীইসুম) বাংলায় যাইতে হয়; এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিশেষতঃ অরণ্যের ও বিস্তৃত তুষারের দৃশ্য অপূর্ব্ব। দ্বিতীয় দিন ১২ মাইল দূরবর্ত্তী অরি। প্রথম দিন রিসিসুম না গিয়া ১২ মাইল দূরে পিডং এবং তথা হইতে দ্বিতীয় দিন অরি আসা যায়। তৃতীয় দিন আরও ১২ মাইল দূরে সিডনচেন। চতুর্থ দিন ৯ মাইল দূরে ১২,৩০০ ফুট উচ্চ গ্নাটং পৌঁছিতে হয়। পরদিন কাপুপ হইয়া ৮ মাইল দূরবর্ত্তী জেলেপলা গিরিসঙ্কট দেখিয়া ৩ মাইল পথ ফিরিয়া আসিয়া কাপুপ ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতে হয়। জেলেপলা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১৪,৩৯০ ফুট উচ্চ; এখান হইতে চম্বি উপত্যকা এবং তিব্বতের বিশাল অধিত্যকা চমৎকার দেখিতে পাওয়া যায়। কাপুপ বাংলা অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ একটি হ্রদের প্রান্তে অবস্থিত। কাপুপ হইতে গ্নাটং সেডনচেন পথে না ফিরিয়া চঙ্গু কার্পোনাং ও গংটক হইয়াও ফেরা যায়। শেষের পথে আসিলে নাথুলা গিরিসঙ্কট ও চঙ্গু হ্রদ দেখিয়া আসা যায়।

## (খ) কলিকাতা—ডায়মণ্ড হারবার ও বজ-বজ, ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর শাখা।

**বালীগঞ্জ জংশন**—কলিকাতা হইতে ৪ মাইল দূর। ইহা বর্ত্তমানে কলিকাতা মহানগরীরই অংশ বিশেষে পরিণত হইয়াছে। স্টেশনের অনতিদূরে পারশীদের সমাধি-মন্দির বা টাওয়ার অফ সাইলেন্স্ একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। পারশীগণ শবদেহের অগ্নি সংস্কার বা কবর দেন না। একটি উচ্চ ভবনের ছাদের উপর উহা রাখিয়া দেন; চিল, শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী উহা ভক্ষণ করিয়া ফেলে।

বালীগঞ্জ হইতে একটি শাখা লাইন কলিকাতা হইতে ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী বজ-বজ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে কালীঘাট, মাঝের হাট, নঙ্গী ও বজ-বজ উল্লেখযোগ্য স্টেশন।



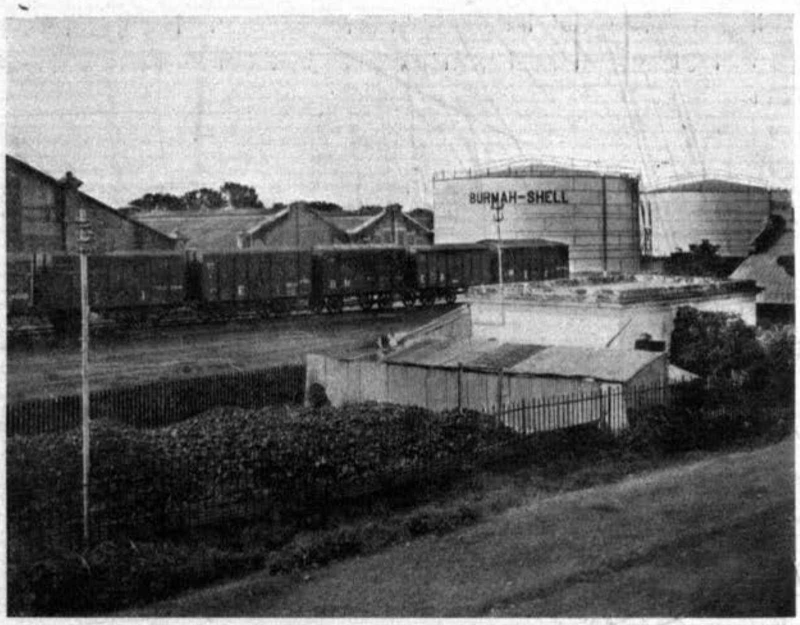
সাধারণ দৃশ্য, বাটানগর

**মাঝেরহাট**—মাঝেরহাটও একটি জংশন স্টেশন। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৮ মাইল। এখান হইতে কালীঘাট-ফলতা লাইট রেলওয়ের আরম্ভ। খিদিরপুরের সুবিখ্যাত ডকগুলি ইহার নিকটে অবস্থিত। ডকে জাহাজ হইতে যত মাল নামে, তাহার অধিকাংশই রেলগাড়ীতে মাঝেরহাট হইয়া আসে। মাঝেরহাটের অতি নিকটে আলিপুরের "এরোড্রোম" বা বিমান ঘাঁটি অবস্থিত।

**নঙ্গী**—কলিকাতা হইতে ১৪ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটে সুবিখ্যাত জুতা নির্ম্মাতা বাটা কোম্পানির একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়া

একটি বিরাট শ্রমিক উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই উপনিবেশটির নাম দেওয়া হইয়াছে বাটানগর। চর্ম্ম শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে বাটানগর একটি দ্রষ্টব্য স্থান।

**বজ-বজ**—কলিকাতা হইতে ১৭ মাইল দূর। বজ-বজ শহর গঙ্গার তীরে অবস্থিত। ইহা ভারতের মধ্যে একটি প্রধান কেরোসিন তৈল ও পেট্রোলের বন্দর। এক শ্রেণীর বিশেষ জাহাজে করিয়া বিদেশ হইতে কেরোসিন তৈল ও পেট্রোল আনা হয়। তৈল-বাহী জাহাজ বজ-বজে আসিলে উহা হইতে পাম্পযোগে কেরোসিন তৈল তুলিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কে রাখা হয় ও পরে বিশেষ গাড়ীতে করিয়া স্থানান্তরে চালান দেওয়া হয়।




কেরোসিন তৈলের ডিপো—বজ-বজ

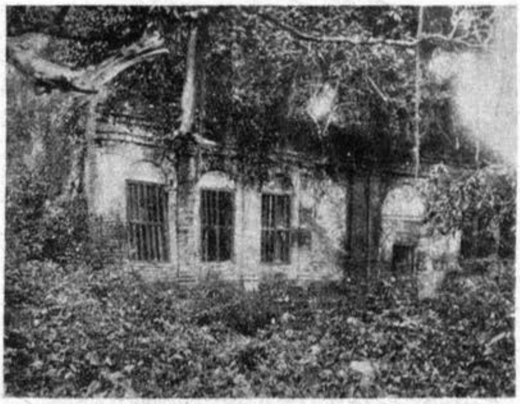
বজ-বজে মুসলমান যুগে একটি দুর্গ ছিল; ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা আক্রমণের প্রাক্কালে ক্লাইভ কর্তৃক উহা অধিকৃত হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং কামান ও সাজ্ সরঞ্জাম কলিকাতা দুর্গে লইয়া যাওয়া হয়। দুর্গের পরিখার চিহ্ন এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়।

বজ-বজের নিকটে কয়েকটি পাটকল ও কাপড়ের কল আছে। বজ-বজ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাগীরথী কূলে আচিপুর গ্রামে চীনাদের একটি মন্দির আছে। প্রতি বৎসর মাঘ-ফাল্গুন মাসে উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা প্রবাসী চীনারা এই স্থানে সমবেত হন। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় টং আচু নামে একজন চীনদেশীয় ব্যক্তি এই স্থানে একটি চিনির কল স্থাপন করেন। তাঁহার নাম হইতেই গ্রামটি আচিপুর নাম পাইয়াছে। এই স্থানে টং আচুর অশ্বক্ষুর আকৃতির কবর আছে।

**যাদবপুর**—কলিকাতা হইতে ৫ মাইল দূর। এখানে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার জন্য একটি বড় হাসপাতাল আছে। এখানকার এঞ্জিনীয়রিং কলেজ বাংলা দেশের মধ্যে একটি বিখ্যাত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক যুবক এখান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া বিবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

**গড়িয়া**—কলিকাতা হইতে ৮ মাইল দূর। স্টেশনের বিপরীত দিকে একটি প্রকাণ্ড বিল আছে। বর্ষাকালে জলপূর্ণ হইয়া এই বিলটি একটি হ্রদের মত দেখায়। এখানে অনেকে পক্ষী শিকার করিতে আসেন। এই বিল হইতে প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে মৎস্য কলিকাতায় চালান যায়।

গড়িয়া হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী **বোড়াল** একটি প্রসিদ্ধ ও পুরাতন স্থান। এই পল্লী সুবিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যিক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জন্মস্থান। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্‌টেম্বর রাজনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। সেকালের হিন্দু কলেজের যে



রাজনারায়ণ বসুর বাসভবন, বোড়াল

সকল ছাত্র উত্তরকালে বাংলার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ তাঁহাদিগের অন্যতম। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত রাজনারায়ণের সহপাঠী ছিলেন এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। হিন্দু কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজনারায়ণ ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব রাজনারায়ণকে ডেপুটি ম্যাজি-ষ্ট্রেটের পদ দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত চাকুরী তাঁহার মনঃপুত না হওয়ায় তিনি স্কুল মাস্টারের কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি মেদিনীপুর গভর্ণমেন্ট স্কুলের হেড মাস্টার নিযুক্ত হন। তৎকালে শিক্ষিত সমাজে সুরাপান প্রচলিত ছিল। রাজনারায়ণ ইহা নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও ব্যায়াম চর্চ্চায়ও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। রাজনারায়ণ কতকগুলি বাংলা পুস্তক প্রণয়ন করেন। তৎপ্রণীত "সে কাল আর এ কাল" "বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব" ও "বিবিধ প্রবন্ধ" প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ পরলোক গমন

করেন। জগদ্বিখ্যাত মনীষী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র। রাজনারায়ণ বসুর জন্মভিটা এখন পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ। ইহার সংস্কার ও সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা এখনও হয় নাই।

বোড়াল গ্রামে কতকগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন ইষ্টকস্তূপ ও লুপ্তপ্রায় একটি দীঘি আছে। এই স্থান হইতে প্রাপ্ত ইষ্টকগুলির মধ্যে কতকগুলি চতুষ্কোণ, কতকগুলি ত্রিকোণ এবং কতকগুলি গোলাকার। ইষ্টকগুলি কারুকার্য্যখচিত ও সুদৃঢ়। এইগুলির সহিত সুযোগ্য সেন নামক সেনবংশীয় জনৈক নৃপতির সংশ্রব আছে বলিয়া কেহ কেহ



ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী, বোড়াল

অনুমান করেন। এই দীঘির অতি নিকটে "ত্রিপুরা সুন্দরীর পীঠ" নামে একটি দেবস্থান আছে। কথিত আছে সেনবংশীয় রাজা সুযোগ্য সেন প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেবীপীঠের প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর প্রাচীন মন্দির কালপ্রভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। পুরাতন দেবী প্রতিমার অনুকরণে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অষ্টধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত ত্রিপুরা-সুন্দরীর বিগ্রহ বর্ত্তমানে এই গ্রামে পূজিত হইতেছেন। এই ধাতুময়ী মূর্ত্তি বেশ বড় ও অতি সুন্দর। দেবী প্রতিমার পাদপীঠে দশমহাবিদ্যার অন্যতম ষোড়শী বা ত্রিপুরাসুন্দরীর ধ্যান অনুযায়ী পঞ্চদেবতার মূর্ত্তি উৎকীর্ণ, তদুপরি শিব শবরূপে শয়ান। শিবের নাভি-পদ্মস্থিত পদ্মের উপর চতুর্ভুজা ত্রিনয়না সুন্দরী ষোড়শী মূর্ত্তি উপবিষ্টা। পাদপীঠস্থ পঞ্চদেবতার নাম ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ঈশ্বর ও রুদ্র। ইহারা সকলেই চতুর্ভুজ; ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ ও রক্তবর্ণ, বিষ্ণু শ্যামলবর্ণ, মহেশ্বরের মুখ পাঁচটি, বর্ণ তুষারশুভ্র; ঈশ্বর ও

রুদ্র শিবেরই মূর্ত্তিভেদ বিশেষ, তবে ইহাদের মুখ একটি করিয়া; ঈশ্বর শুভ্রবর্ণ, রুদ্রের গায়ের রং কমলা নেবুর রংয়ের ন্যায়। এই সুন্দর বিগ্রহটি একটি দেখিবার মত বস্তু। এখানে প্রতিবৎসর মাঘমাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে মহোৎসব হয়।

গড়িয়া হইতে বোড়াল গ্রামে যাইবার পথে ভাগীরথীর লুপ্ত খাত দেখা যায়। ইহার তীরে এখনও প্রাচীনকালে নির্ম্মিত কতকগুলি শিবমন্দির দৃষ্ট হয়।

**সোনারপুর জংশন**—কলিকাতা হইতে ১০ মাইল দূর। ইহা চব্বিশ পরগণা জেলার একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। ইহার নিকটবর্ত্তী রাজপুর ও হরিনাভি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই স্থান হইতে একটি শাখা পথ কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূরবর্ত্তী ক্যানিং পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখা পথে ঘুটিয়ারী শরীফ ও ক্যানিং উল্লেখযোগ্য ষ্টেশন।



মসজিদ, ঘুটীয়ারি শরীফ

**ঘুটিয়ারী শরীফ**—কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দূর। ইহা মুসলমানগণের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। ষ্টেশনের নিকটেই সুবিখ্যাত পীর গাজী মোবারক আলি সাহেবের দরগাহ্ ও মসজিদ অবস্থিত। গাজী সাহেবের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষ কিছুই জানা যায় না, তবে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। যে স্থানে ঘুটিয়ারী শরীফ অবস্থিত উহা মদনমল পরগণার অন্তর্গত। পূর্ব্বে এই অঞ্চল সুন্দরবনের অংশ বিশেষ ছিল। কথিত আছে যে গাজী সাহেব অদ্ভুত ক্ষমতাবলে বনের ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে বশীভূত করিয়া এই অঞ্চলে মনুষ্যের বসতি স্থাপন করেন। তিনি ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। একবার স্থানীয় জনৈক নাবালক জমিদার বাদশাহ সরকারে সময়মত খাজনা না দিতে পারায় বাদশাহের আদেশে ধৃত হইয়া রাজধানীতে নীত হন। বালকের জননীর ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া গাজী সাহেব একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে বাদশাহের দরবারে গিয়া উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য,

বাদশাহ তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন ও বালককে মুক্ত করিয়া দেন। অতঃপর বাদশাহ গাজী সাহেবের নামে মদনমল পরগণার জমিদারী সনদ প্রদান করেন। সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামে গাজী মোবারক আলি বা সংক্ষেপতঃ মোবারক গাজী ও তাঁহার ভ্রাতা কালু হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে পূজিত হন। গাজী সাহেবের দেহত্যাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনীটি প্রচলিত আছে—

একবার ভীষণ অনাবৃষ্টি হইয়া অজন্মা উপস্থিত হইলে শিষ্যগণের অনুরোধে গাজী সাহেব খোদার দরবারে আরজি পেশ করিবার জন্য একটি গৃহের মধ্যে গিয়া উহার অর্গল বন্ধ করিয়া দেন এবং প্রত্যেককে সাবধান করিয়া বলেন যে যতক্ষণ তিনি ধ্যানস্থ

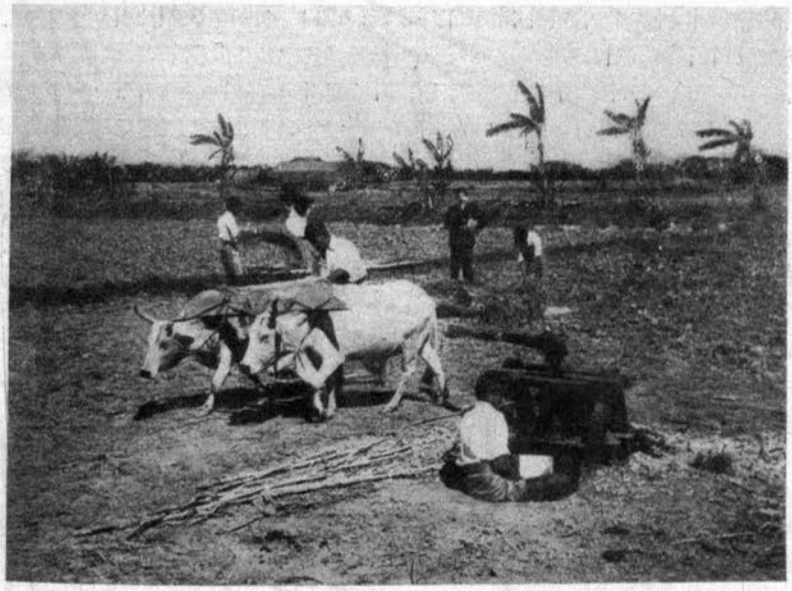


পল্লী সংগঠন প্রতিষ্ঠান গোসাবা,

থাকিবেন, ততক্ষণ যেন কেহ গৃহমধ্যে প্রবেশ না করে। ক্রমে ক্রমে তিন দিন চলিয়া গেল, গাজী সাহেবের বাহিরে আসার কিন্তু কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। তখন জন-কয়েক লোক নানারূপ আশঙ্কা করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবং দেখিতে পায় যে গাজী সাহেবের দেহ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে। তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহারা সেই গৃহমধ্যেই কবর খুঁড়িয়া তাঁহাকে সমাহিত করে। সেই দিনই কিন্তু প্রবল বারিপাত হয় ও রাত্রে গাজী সাহেব জনৈক অনুরক্ত শিষ্যকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে তাঁহার ধ্যানস্থ দেহকে ভুলবশতঃ মৃতদেহ মনে করিয়া লোক-গুলি তাঁহার কবর দিয়াছে। অম্বুবাচীর সময় এই ঘটনাটি ঘটে। ঘুটিয়ারী শরীফের সুন্দর ও বৃহৎ মস্‌জিদ্‌টি গাজী সাহেবের সমাধির উপর নির্ম্মিত। প্রতি বৎসর আষাঢ়

ও ভাদ্রমাসে গাজী সাহেবের স্মরণার্থে ঘুটিয়ারী শরীফে দুইটি বৃহৎ মেলা হয়। এই মেলায় বহু মুসলমান ও হিন্দুভক্ত উপস্থিত হইয়া গাজী সাহেবের দরগাহে শিরণি দিয়া থাকেন। এখানে প্রতি শুক্রবার বহু লোকের সমাগম হয়।

**ক্যানিং**—কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূর। ক্যানিং, ক্যানিং টাউন বা পোর্ট ক্যানিং মাতলা নামক একটি বিস্তৃত নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার উত্তরে বিদ্যাধরী প্রবাহিত। এই স্থানের দেশীয় নাম মাতলা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লর্ড ক্যানিংএর সময়ে ভাগীরথী নদীতে অতিমাত্রায় বালি পড়ায় যখন কলিকাতা বন্দর সম্বন্ধে নানারূপ আশঙ্কা হইতেছিল, সেই সময়েই পোর্ট ক্যানিংএর সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য ভাগীরথীর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং কলিকাতা হইতে বন্দরও আর স্থানান্তরিত করিতে



আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, গোসাবা

হয় নাই, সুতরাং ক্যানিংএর আর তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। ক্যানিং বন্দরের জন্য মাতলার উপর পাঁচটি এবং বিদ্যাধরীতে দুইটি জেটি, ডক ও ট্রামওয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল; ইহার এখন কিছুই নাই। ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৬টি জাহাজ আসিয়াছিল, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে একটি জাহাজও ভিড়ে নাই। বর্ত্তমানে এই স্থান পোর্ট ক্যানিং জমিদারী কোম্পানির অধিকারভুক্ত। ইহা একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। সুন্দরবন অঞ্চলের বহু পণ্যদ্রব্য এই স্থান দিয়াই যাতায়াত করে। প্রকৃতপক্ষে ক্যানিংএর অপর পার হইতেই সুন্দরবন এলাকার আরম্ভ। ক্যানিংএর অবস্থান অতি সুন্দর, নদীর জলোচ্ছ্বাস হইতে শহর রক্ষা করিবার জন্য নদীতীর দিয়াই একটি দীর্ঘ বাঁধ আছে। এই বাঁধের উপর হইতে নদীর দৃশ্য সত্যই মনোরম। কলিকাতা হইতে ছাত্রছাত্রীরা এবং অন্যান্য বহু

লোক এই বাঁধে ভ্রমণের জন্য আসিয়া থাকেন। ক্যানিং হইতে প্রচুর পরিমাণে ধান, চাউল, গরাণকাঠ, ও গোলপাতা প্রভৃতি আমদানি হয়।

ক্যানিং বা মাতলা শহরের উত্তরদিকে মাতলা বিদ্যাধরী নদীর মোহানায় প্রতাপাদিত্যের একটি দুর্গ ছিল। ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন প্রতাপের প্রসিদ্ধ সেনানায়ক হায়দার মানক্কী, সেই জন্য দুর্গের নাম হয় হায়দারগড়। এখনও বুরুজখানা নামে উচ্চ ঢিবি, নিকটস্থ প্রতাপনগর গ্রাম, রাজার খাল, হায়দার আবাদ প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছে। সুন্দরবনের ৫৭ নং লাটে হায়দার আবাদ অবস্থিত।

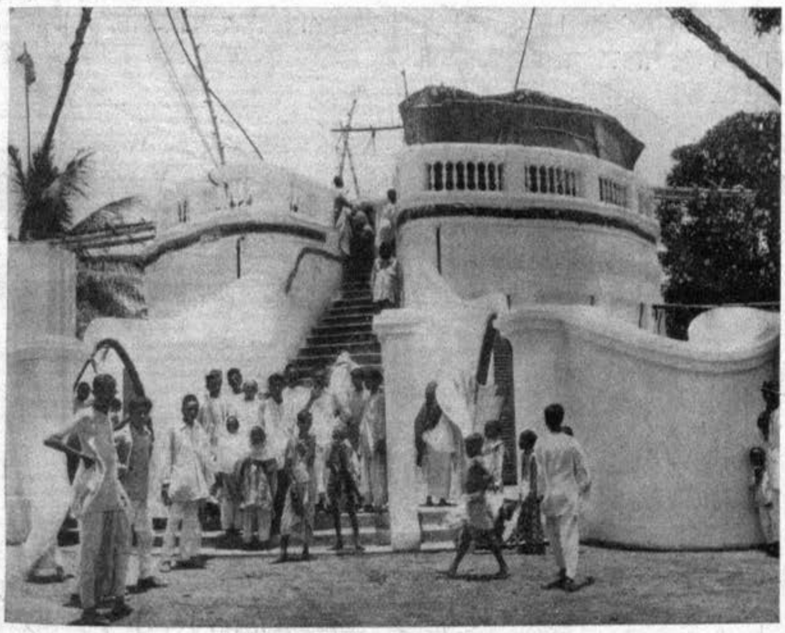
ক্যানিং টাউন হইতে নৌকা বা মোটরলঞ্চযোগে সুন্দরবনের অন্তর্গত স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের জমিদারী গোসাবায় যাওয়া যায়। প্রত্যহ বেলা ১টার সময় ক্যানিং হইতে গোসাবার মোটরলঞ্চ ছাড়ে। সুন্দরবন অঞ্চলে চাষ আবাদ প্রবর্ত্তনের জন্য স্যার ড্যানিয়েল সরকারের নিকট হইতে বহু জমি গ্রহণ করিয়া গোসাবায় একটি আদর্শ কৃষি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। এখানে ভদ্র ও বেকার যুবকগণকে অতি সুলভে বাসস্থান ও কৃষি কার্য্যের উপযোগী জমি বিলির ব্যবস্থা আছে। স্যার ড্যানিয়েলের প্রচেষ্টায় শ্বাপদ সঙ্কুল সুন্দরবনের মধ্যে গোসাবা একটি আদর্শ পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। এখানে সাধারণ শিক্ষার সহিত হাতে কলমে কৃষি শিক্ষা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান আছে। এখানে সুন্দর পথঘাট নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, যৌথ ভাণ্ডার আছে, সুপেয় জলের ব্যবস্থা আছে, উৎপন্ন দ্রব্যের খরিদ বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত রহিয়াছে। এক কথায় গোসাবাকে একটি আদর্শ ও আধুনিক পল্লী বলা যাইতে পারে। ইহার এলাকার মধ্যে বিনিময়ের জন্য "গোসাবা নোট" নামক এক প্রকার নোটও প্রচলিত আছে। অতিথি অভ্যাগতগণের থাকিবার জন্য গোসাবায় একটি "গেস্ট হাউস" বা অতিথিশালা আছে।

**চাংড়িপোতা**—কলিকাতা হইতে ১৩ মাইল দূর। এই গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন সংবাদপত্র "সোমপ্রকাশ" সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জন্মস্থান। তদীয় সমসাময়িকযুগে দ্বারকানাথ একজন প্রসিদ্ধ মনীষীরূপে পরিচিত ছিলেন। তৎসম্পাদিত "সোমপ্রকাশ" বাংলার শিক্ষিত সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল। সুরুচিসম্মত প্রণালীতে সংবাদপত্র সম্পাদনে দ্বারকানাথকে অগ্রণী বলা যাইতে পারে। তৎপ্রণীত "নীতিসার" "রোমের ইতিহাস" "গ্রীসদেশের ইতিবৃত্ত" প্রভৃতি পুস্তক তৎকালে বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়। স্বনামখ্যাত শিবনাথ শাস্ত্রী দ্বারকানাথের ভাগিনেয় ছিলেন। শিবনাথ চাংড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সম্প্রতি দ্বারকানাথের বসতবাটীতে শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি স্মৃতি ফলক স্থাপিত হইয়াছে।

**মল্লিকপুর**—কলিকাতা হইতে ১৪ মাইল দূর। এই স্থানে নাখোদা সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণের একটি দরগাহ আছে। ইহা ফকির আবদুল্লা আত্তাসের দরগাহ নামে পরিচিত। দরগাহের মস্‌জিদটি দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার সমীপস্থ একটি কূপের

জলের রোগ আরোগ্য করিবার অদ্ভুত শক্তি আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এই পবিত্র কূপ হইতে জল লইবার জন্য এখানে প্রতি শুক্রবার বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

মল্লিকপুরের নিকটবর্ত্তী **মাইনগর** গ্রাম ইতিহাস বিশ্রুত পুরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসুর জন্ম স্থান। পুরন্দর খাঁ গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী বা উজির ছিলেন এবং তৎপুত্র কেশব খাঁ ছত্রনাজিরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে কেশব খাঁর নামোল্লেখ আছে। তিনি ছত্রনাজির বা Grand Master of the Royal Umbrella ছিলেন বলিয়া অনেক স্থলে কেশব "ছত্রি" নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। রাজসরকারে পিতা পুত্রের অসীম প্রতিপত্তি ছিল। পুরন্দর খাঁ শিয়াখালার রাজাকে পরাজিত করিয়া তথায় স্বনামে পুরন্দর গড়ের প্রতিষ্ঠা করেন। শিয়াখালা স্টেশন দ্রষ্টব্য।



মল্লিকপুরের দরগাহ্

**বারুইপুর জংসন**—কলিকাতা হইতে ১৬ মাইল দূর। এখানে একটি মুনসেফী আদালত আছে। ইহার পাশ দিয়া পূর্ব্বে গঙ্গার একটি শাখা প্রবাহিত হইত। স্থানটি পানের চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। পান ব্যবসায়ী বারুইজাতি হইতে ইহার নাম হইয়াছে বারুইপুর। রাস-যাত্রা এবং রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলায় লোক-শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ সুন্দর দেশীয় পুতুল প্রভৃতি বিক্রীত হয়। বারুইপুর হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে লুপ্তস্রোতা গঙ্গার উপর আটিসারা গ্রামের "মহাপ্রভু-বাটি" একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। চৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুর

হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী পথ দিয়া পুরীযাত্রা কালে আটিসারা গ্রামে অনন্ত নামক জনৈক সাধু ব্রাহ্মণের বাটিতে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে রাত্রি যাপন করেন, যথা—

"সর্ব্ব রাত্রি কৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে॥
শুভ দৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি, "হরি, হরি॥"

আটিসারার মহাপ্রভু-বাটিতে গৌর নিতাই বিগ্রহের নিত্য পূজা হয় এবং বৈশাখ মাসে এখানে পক্ষকাল স্থায়ী একটি মেলা হয়।

বারুইপুর জংসন হইতে একটি শাখাপথ ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী লক্ষীকান্তপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে ধপধপি, দক্ষিণ বারাশত, বহড়ু, জয়নগর-মজিলপুর ও মথুরাপুর রোড উল্লেখযোগ্য স্টেশন। এই সকল স্থানের পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথীর প্রাচীন খাত এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

**ধপধপি**—কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দূর। এই গ্রামে ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায় বা দক্ষিণেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। কবি কৃষ্ণরাম দাসের "রায়মঙ্গল" নামক কাব্যে দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত আছে ("বেলঘরিয়া" স্টেশন দ্রষ্টব্য)।



দক্ষিণরায়, ধপধপি

পূর্ব্বে এই অঞ্চল সুন্দরবনের অংশ ছিল এবং এখানে ব্যাঘ্রের ভয়ানক দৌরাত্ম্য ছিল। যাহারা সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু, মোম বা কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাইত, তাহারা ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়কে ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিত। লোকের বিশ্বাস ইহাতে তাহাদের আর কোন বিপদ ঘটিত না এবং তাহারা প্রচুর পরিমাণে মোম ও মধু পাইত। সময়ে সময়ে দক্ষিণরায়ের স্বপ্নাদেশে তাঁহার নিকট নরবলি দিয়া তাঁহার প্রসন্নতা অর্জ্জন করিতে হইত। "বনবিবির জহুরানামা" নামক পুঁথিতে বর্ণিত

আছে যে একবার কলিঙ্গা নগরবাসী ধনা মনা নামক বণিক ভ্রাতৃদ্বয় জনৈক অনাথা বিধবার "দুখে" নামক বালক পুত্রকে ভুলাইয়া সুন্দরবনে নিয়া গিয়া দক্ষিণরায়ের আদেশে নরবলি দিবার উপক্রম করিলে, দুখের কাতর ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া সুন্দরবনের অধীশ্বরী বনবিবি স্বীয় বীর অনুচর জঙ্গলী শার দ্বারা দক্ষিণরায়ের ব্যাঘ্রের কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করেন। জঙ্গলী শার নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দক্ষিণরায় কুমারখালির জঙ্গলে আসিয়া বড়খাঁ গাজীর শরণাপন্ন হন। দক্ষিণরায়ের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বড়খাঁ গাজী দক্ষিণরায়কে সঙ্গে করিয়া কেঁদোখালির চরে বনবিবির দরবারে হাজির হইলেন। বনবিবি তখন অনাথিনীর পুত্র দুখেকে কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন।

"হেনকালে উপনীত গাজী দক্ষিণরায়।
ছালাম করিল রায় বনবিবির পায়॥
তাতল খাঁ খোশাল খাঁ আর অলিগণ।
কর জুড়ি করিয়া আইল সর্ব্বজন॥
হরি রায় বিষম রায় আর কাল রায়।
আসিয়া ছালাম করে বনবিবির পায়॥

কহেন বড়খাঁ গাজী শুন নেক মাই।
তোমার হুজুরে মাগো এই ভিক্ষা চাই॥
দক্ষিণরায়ের পর কোপ কর দূর।
এখাতের আইলাম তোমার হুজুর॥
এতেক শুনিয়া মায়ের দয়া উপজিল।
সদয় হইয়া মাতা বলিতে লাগিল॥

আঠার ভাটির মধ্যে আমি সবার মা।
মা বলে যে ডাকে তার দুঃখ থাকে না॥
সঙ্কটে পড়িয়া যে বা মা বলে ডাকিবে।
কদাচিৎ হিংসা তায় কভু না করিবে॥

রায় বলে শুন মাতা আরজ আমার।
সত্য সত্য তিন সত্য সত্য অঙ্গীকার॥
বনেতে আসিয়া যে বা মা বলে ডাকিবে।
আমা হৈতে হিংসা তার কদাচ না হবে॥"

(মুনশী বয়নদ্দিন রচিত পুঁথি)

এইরূপে বড়খাঁ গাজীর মধ্যস্থতায় বনবিবির সহিত দক্ষিণরায়ের আপোষ-রফা হইল। বনবিবির আদেশে ধনা-মনা দুখেকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সে যাত্রা নিস্তার পায়।

প্রভাকর রায়ের পুত্র ও ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুটরায়ের সেনাপতি মানুষ দক্ষিণ-রায় কি করিয়া সুন্দরবনের একাংশের আধিপত্য লাভ করেন ও পরে দেবত্ব প্রাপ্ত হন, সে কথার উল্লেখ পরে করা হইয়াছে ("ঝিকারগাছা ঘাট" দ্রষ্টব্য)।

ধপধপির দক্ষিণরায়ের মূর্ত্তিটি যোদ্ধবেশধারী ও অতি বীরত্ব-ব্যঞ্জক। ইহার পরিধানে কাষায় বস্ত্র, গলে উত্তরীয়, মস্তকে উষ্ণীষ, কর্ণে স্নুবর্ণ কুণ্ডল, প্রকোষ্ঠে স্নুবর্ণবলয়, পৃষ্ঠদেশে বানপূর্ণ তুণীর ও ধনু, হস্তে নালিকা ও উন্মুক্ত কৃপাণ এবং কোমরবন্ধে শাণিত ছুরিকা। এইরূপ বীরবেশধারী বিগ্রহ বাংলার আর কোথাও নাই। দেখিলে মনে হয় স্নুন্দরবনের দেবতার এই অপরূপ রূপ-সজ্জা স্থানোপযোগীই বটে। এই দেবতার স্বতন্ত্র কোন ধ্যান নাই। গণেশের ধ্যানে ইহার পূজা হইয়া থাকে।

বাতরোগ-গ্রস্ত বহু রোগী ও তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন এই দেবতার কৃপা লাভের জন্য এখানে আগমন করেন। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে এখানে ছোটখাট মেলা হয় এবং মাঘ মাসের ১লা তারিখে সমস্ত দিবস ধরিয়া মহাসমারোহে দেবতার পূজা ও এতদুপলক্ষে বাতের ঔষধ লইবার জন্য বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

ধপধপির অদূরে প্রাচীন ভাগীরথীর গর্ভে "কালীদহ" ও "শিঙ্গাদহ" নামে দুইটি দহ দেখা যায়। প্রবাদ, সিংহল যাত্রাকালে শ্রীমন্ত সদাগর এই কালীদহেই নাকি কমলে কামিনী দর্শন করিয়াছিলেন। "দ্বারীর জাঙ্গাল" নামে একটি প্রাচীন রাজপথের ভগ্নাবশেষও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পথ দিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন।

**দক্ষিণ বারাশত**—কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দূর। এখানে একটি কালী মন্দির এবং "আদ্যমহেশ" নামে একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। কথিত আছে, পিতার অন্বেষণে সিংহল যাত্রাকালে শ্রীমন্ত সদাগর এই শিবের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ত সদাগর একশত বার এই শিবকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম "বারাশত" হয়—এইরূপ একটি প্রবাদও প্রচলিত আছে এবং এই জেলার অন্যতম মহকুমা সদর বারাসাতের সহিত পার্থক্য করিবার জন্য ইহার "দক্ষিণ" বিশেষণ মিলিয়াছে। এখানকার শিবের মন্দিরটি খুব প্রাচীন। কয়েকটি সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া মন্দির গর্ভে শিবকে দর্শন করিতে হয়। মন্দিরের নিকটে একটি পুষ্করিণী আছে। বর্ষাকালে পুষ্করিণীটির জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মন্দির অভ্যন্তরস্থ শিবলিঙ্গের কুণ্ডটি জলপ্লাবিত হইয়া যায়। ভূনিম্ন দিয়া গর্ভ মন্দিরের সহিত এই পুষ্করিণীটির যোগাযোগ আছে বলিয়াই এইরূপ সংঘটিত হয়। "আদ্য মহেশ" এই অঞ্চলের একটি বিখ্যাত দেবস্থান। শিবরাত্রির সময় এখানে বহু জনসমাগম হয়।

অচলানন্দ তীর্থস্বামী নামক একজন সাধুর সমাধি এই গ্রামে আছে।

**বহড়ু**—কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূর। ইহাও একটি প্রাচীন গ্রাম। এই স্থানের প্রাচীন নাম "বড়ুক্ষেত্র"। এখানকার জমিদার বস্নুদিগের প্রতিষ্ঠিত শ্যামস্নুন্দর জীউর মন্দিরের কারুকার্য্য অতি স্নুন্দর। এই বংশীয় দেওয়ান নন্দকুমার বস্নু মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দজী, মদনমোহনজী ও গোপীনাথজীর জন্য নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই বংশীয় রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বস্নু কতকগুলি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। সঙ্গীত শাস্ত্রেও বৈকুণ্ঠনাথের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

বহড়ুর নিকটবর্ত্তী ময়দা গ্রামে এক পুরাতন কালী আছেন। ইনি ময়দার মহাকালী নামে পরিচিত। ইঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও এতদঞ্চলে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

**জয়নগর-মজিলপুর**—কলিকাতা হইতে ৩১ মাইল দূর। জয়নগর ও মজিলপুর পাশাপাশি অবস্থিত তুইটি ভিন্ন গ্রাম হইলেও সাধারণের নিকট ইহা "জয়নগর-মজিলপুর" এই যুগ্মনামে পরিচিত। এই গ্রাম তুইটির ন্যায় বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লী এতদঞ্চলে আর নাই। এই উভয় গ্রামেই প্রাচীন ও আধুনিক কালের বহু দেবায়তন ও দীঘিকা অবস্থিত। এখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্ট নেতা আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় জয়নগর-মজিলপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত "নিমাই সন্ন্যাসের" সুন্দর কবিতাটি বোধ হয় অনেকেরই মুখস্থ আছে। শিবনাথের "মেজ বউ" "নয়নতারা" প্রভৃতি উপন্যাসগুলিও পাঠক সমাজে সুপরিচিত। সুকবি গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী মজিলপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

জয়নগরে অতি উৎকৃষ্ট খইয়ের মোয়া ও সুগন্ধি পয়রা গুড় পাওয়া যায়।

পঞ্চম দোলযাত্রা উপলক্ষে এখানে ১০ দিন ব্যাপী একটি মেলা বসিয়া থাকে।



বদরিকানাথ শিব, বড়াশী মাধবপুর

**মথুরাপুর রোড**—কলিকাতা হইতে ৩৪ মাইল দূর। ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে বড়াশী মাধবপুর গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ চক্রতীর্থ অবস্থিত। নিকটেই ছত্রভোগে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির। বড়াশী গ্রামে বদরিকানাথ নামক এক

প্রাচীন শিবলিঙ্গ ও মাধবপুরে "সঙ্কেত মাধব" নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। বদরিকানাথ শিবের মন্দিরটি দেখিতে অনেকটা তারকেশ্বরের মন্দিরের ন্যায়। একটি উচ্চ ভূখণ্ডের উপর মন্দিরটি অবস্থিত। নিকটে একটি পুষ্করিণী আছে, উহার জল পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। এই পুষ্করিণীটির নাম শিবকুণ্ড। পুত্রাভিলাষিনী রমণীগণ সুপুত্র লাভের আশায় এখানে অবগাহন করিয়া থাকেন। বদরিকানাথের প্রাচীন নাম **অম্বু লিঙ্গ**। বড়াশী মাধবপুর প্রভৃতি গ্রাম পূর্ব্বে ছত্রভোগেরই অন্তর্গত ছিল এবং তৎকালে ইহার পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। এখনও এই অঞ্চলে গঙ্গার লুপ্তপ্রায় খাত দেখিতে পাওয়া যায় এবং বর্ষাকালে ঐ খাতের বিভিন্ন অংশ জল পূর্ণ হয়। অম্বুলিঙ্গ শিবের মন্দির পূর্ব্বে গঙ্গার তটে অবস্থিত ছিল এবং এই স্থান অম্বুলিঙ্গঘাট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চৈতন্য ভাগবতে ছত্রভোগ ও অম্বুলিঙ্গ ঘাটের সবিশেষ বর্ণনা আছে। শান্তিপুর হইতে পুরী গমনকালে শ্রীচৈতন্যদেব যে গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া গমন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ছত্রভোগে আসিয়া তিনি অম্বুলিঙ্গ শিবকে দর্শন ও অম্বুলিঙ্গ ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই নৌকা-যোগে তিনি ওড়িষ্যায় গমন করেন। তৎকালে ছত্রভোগে রামচন্দ্র খাঁ নামক জনৈক জমিদার বাস করিতেন। তিনিই শ্রীচৈতন্যদেবের ওড়িষ্যা গমনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। "অম্বুলিঙ্গ" নাম সম্বন্ধে চৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে পূর্ব্বে যখন ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করেন, তখন মহাদেব দীর্ঘকাল গঙ্গার বিরহে অধীর হইয়া তাঁহার অনুসরণ করেন এবং ছত্রভোগের নিকট আসিয়া জলরূপে তাঁহার সহিত মিলিত হন, যথা—

"গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।  
বিহ্বল হইলা অতি গঙ্গা অনুরাগে ॥  
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা।  
জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা। —  
*    *    *    *  
জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।  
"অম্বুলিঙ্গ ঘাট" করি ঘোষে সর্ব্বজনে।"

জনশ্রুতি, গঙ্গার স্রোত রুদ্ধ হইবার পর জলময় শিব পাষাণময় শিবলিঙ্গরূপে স্থলভাগে আবির্ভূত হন।

বদরিকানাথ শিবের মন্দিরের অতি নিকটে প্রাচীন ভাগীরথী গর্ভে নন্দা পুষ্করিণী বা চক্রতীর্থ অবস্থিত। কথিত আছে, শিবের সহিত গঙ্গার মিলন কালে জলস্রোতের গর্জ্জন স্তব্ধ হইলে অগ্রগামী ভগীরথ সংশয়াকুলচিত্তে পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি করিতে থাকেন; তখন গঙ্গাদেবী স্বকরস্থিত জ্যোতির্ম্ময় চক্র উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে দেখান। শিবগঙ্গার মিলন স্থলে এই চক্র প্রদর্শিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ স্থান চক্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। চৈত্রমাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশী এই তিন তিথিকে নন্দা বলে। এই জন্য চক্রতীর্থের অপর এক নাম নন্দা। বর্ত্তমানে নন্দা বা চক্রতীর্থ একটি সাধারণ পুষ্করিণী মাত্র। ইহার পশ্চিম দিকে একটি বাঁধা ঘাট আছে এবং তীরে দুই একটি দেবমন্দির আছে।

ভারতের অন্যান্য স্থানেও "চক্রতীর্থ" এই নামের তীর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরী, কাশী, প্রভাস ও বৃন্দাবনেও এক একটি চক্রতীর্থ আছে। এতদঞ্চলের অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে পুরাণ বর্ণিত চক্রতীর্থ ছত্রভোগেই অবস্থিত। তাঁহারা বলেন যে গঙ্গা, সঙ্কেত মাধব, অম্বুলিঙ্গ শিব ও ত্রিপুরাসুন্দরী শক্তি,—এই চতুর্ব্যূহ-মহাশক্তির অধিষ্ঠানের জন্য প্রাচীন ছত্রভোগই প্রকৃত চক্রতীর্থ। পুরাণে বর্ণিত আছে যে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কর্ম্মফলে অতি দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়া মহাপাতকের ভাগী হন। পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়াও তাঁহার পাপক্ষয় হইল না। তখন শিবের নির্দ্দেশমত চক্রতীর্থে স্নান করিয়া তিনি মহাপাতক হইতে মুক্তিলাভ করেন। কথিত আছে, শুক্রাচার্য্য যে দিন এই স্থানে স্নান করেন, সে দিন নন্দা তিথির সহিত শুক্রবারের সংযোগ ঘটিয়াছিল। এই বিশেষ যোগের নাম ভৃগুনন্দা। এখনও যদি চৈত্র মাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথি শুক্রবারে হয় তাহা হইলে এখানে যাত্রীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়। নন্দা স্নান উপলক্ষে বড়াশী-মাধবপুরে অন্যূন ১৫।২০ হাজার যাত্রীর সমাবেশ হয় এবং সপ্তাহকাল স্থায়ী একটি বিরাট মেলা বসে। মথুরাপুর রোড স্টেশন হইতে মেলার স্থান পর্য্যন্ত মোটর বাস চলে।

নন্দার পুকুর হইতে প্রায় আধ মাইল পশ্চিমে মাধবপুর গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের পর্ণকুটিরে "সঙ্কেত মাধব" বিগ্রহ আছেন। এই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিটি অতি সুন্দর ও ব্রহ্মশিলা বা কষ্টিপাথরের দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার কোন মন্দির নাই।

ছত্রভোগের ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্ত্তিও অতি সুন্দর। এখানে স্নান যাত্রার সময়ে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কেহ কেহ বলেন যে ত্রিপুরাসুন্দরী একটি শক্তিপীঠ, বড়াশী গ্রামের বদরিকা নাথ মহাদেব ইহার ভৈরব।

নন্দা পুষ্করিণী হইতে সামান্য দূরে গঙ্গার খাতের অপর পারে খাঁড়ি নামক গ্রামে "নারায়ণী" নামে এক বিখ্যাত দেবীমূর্ত্তি আছেন। এই দেবী সিংহবাহিনী, ত্রিনেত্রা, দ্বিভুজা ও পীতবর্ণা। নন্দা স্নানের যাত্রিগণ এই দেবীকেও দর্শন করিয়া থাকেন। নারায়ণী দেবীর মন্দিরের অদূরে দক্ষিণরায়ের একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। ধপধপির দক্ষিণরায়ের ন্যায় এই মূর্ত্তিটিরও যোদ্ধবেশ, এবং ইহার হাতেও বন্দুক আছে।

এই সকল স্থান প্রাচীনকালে হাতিয়াগড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রাচীনকালে ছত্রভোগের নিকটে গঙ্গার বহু শাখা ছিল এবং এই স্থানের অনতিদূরে সাগর সঙ্গম ও কপিলাশ্রম অবস্থিত ছিল। চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে,

"সেই ছত্রভোগ গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্ব লোকে করি সুখী॥"

সুন্দরবন অঞ্চলের নদী নালাতে এখনকার দিনেও যে অবস্থা, চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও যে ঠিক সেরূপ ছিল, চৈতন্যভাগবত হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ছত্রভোগ হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের নৌকা ছাড়িবার পর, তাঁহার আদেশে তাঁহার প্রিয় সহচর মুকুন্দ কীর্ত্তন গান আরম্ভ করিলেন,

"অবুধ নাবিক বলে, হইল সংশয়।
বুঝিলাম আজি আর প্রাণ নাহি রয়॥

কূলেতে উঠিলে বাঘে লৈয়া সে পলায়।
জলেতে পড়িলে সে কুম্ভীরে ধরি খায়॥
নিরন্তর এ পানিতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে॥
এতেকে যাবৎ না উড়িয়া দেশ পাই।
তাবৎ নীরব হও সকল গোসাই॥"

মথুরাপুর রোড স্টেশন হইতে প্রায় ছয় মাইল পশ্চিম দিকে মন্দিরবাজার নামক গ্রামে শ্রীকেশবেশ্বরের মন্দির নামে একটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের পুরাতন শিবমন্দির আছে। স্টেশন হইতে এই গ্রাম পর্য্যন্ত কাঁচা রাস্তা আছে। এই রাস্তার পার্শ্ব দিয়া একটি খাল বরাবর মন্দিরবাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তা ধরিয়া প্রায় পাঁচ মাইল পথ গেলে জগদীশপুর গ্রাম। এই গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিকটে হাউড়ির হাট নামক স্থানে দুইটি পুরাতন ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে হাউড়ি নামক জনৈক মহিলার দ্বারা এই হাট ও মন্দির দুইটি স্থাপিত হয়। লাল রঙের লম্বা অথচ হাল্‌কা ইটের দ্বারা এই মন্দির দুইটি নির্ম্মিত। এই মন্দিরদ্বয়ের মধ্যে পদ্মখচিত কৃষ্ণ প্রস্তরের আসনের উপর প্রায় আড়াই হাত উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে।

জগদীশপুর ছাড়িয়া অর্দ্ধ মাইলের কিছু অধিক দূর অগ্রসর হইলে শ্রীকেশবেশ্বরের মন্দিরে পৌছানো যায়। এই মন্দিরটি বেশ বড় ও উচ্চ। মন্দির হইতেই গ্রামের নাম মন্দিরবাজার হইয়াছে। বাজারের মধ্যেই এই মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের চূড়ার দুইটি থাক্। উপরের থাকে তিনটি ত্রিশূলযুক্ত কলস বসানো আছে। বহুদিন ধরিয়া এই মন্দিরের সংস্কার না হওয়ায় ইহার চূড়ার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি আগাছা জন্মিয়াছে। মন্দিরটির তিন দিকে প্রশস্ত বারান্দা ও রোয়াক আছে। প্রধান গম্বুজটি বারান্দা গুলিকে আবৃত করিয়া নির্ম্মিত। মন্দিরের মেঝে শ্বেতপ্রস্তরে মণ্ডিত, বারান্দায়ও অনেকগুলি নাম লেখা শ্বেতপাথর বসানো আছে। মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গের নিত্যসেবার বন্দোবস্ত আছে। মন্দিরের বাহিরের দেওয়ালে কতকগুলি কারুকার্য্য খচিত ইষ্টক আছে এবং দুই পার্শ্বে দুইখানি টালিতে পলতোলা অক্ষরে নিম্নলিখিত লিপিটী উৎকীর্ণ আছে—

"আকাশাব্ধি রসঃ ক্ষৌণীমিতে শাকে শিবালয়ং।
ভূপঃ শ্রীকেশবোকার্ষীদ্বাসুদেবেন শিল্পিনা॥"

অর্থাৎ ১৬৭০ শকাব্দে শ্রীকেশব নামক রাজা বাসুদেব নামক শিল্পির দ্বারা এই শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। বর্ত্তমানে ১৮৬১ শকাব্দ চলিতেছে। সুতরাং এই মন্দির দুই শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সুন্দরবন অঞ্চলে কেশব নামে কোন রাজা ছিলেন কিনা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে ইহার নাম ছিল কেশব রায়-চৌধুরী এবং ইনি নাকি একজন ভূঁইয়া রাজা ছিলেন। কথিত আছে, স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি অরণ্য মধ্যে এই শিবলিঙ্গকে আবিষ্কার করেন এবং স্বীয় নামে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করেন। চৈত্র-সংক্রান্তির সময় কেশবেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গনে মহাসমারোহ হয়।

**লক্ষ্মীকান্তপুর**—কলিকাতা হইতে ৩৯ মাইল দূর। ইহা সুন্দরবনের আবাদী অঞ্চলের অন্তর্গত। এই স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে ধান ও বিচালী প্রভৃতি চালান যায়। এই স্থান হইতে ৩৩ মাইল দূরবর্ত্তী কাকদ্বীপ পর্য্যন্ত একটি কাঁচা রাস্তা আছে। শীত ও গ্রীষ্ম কালে এই পথ দিয়া মোটর বাস যাতায়াত করে। এই পথে লক্ষ্মীকান্তপুর হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী ভাগীরথী তীরে কুলপী গ্রাম অবস্থিত। নদীর ধারে একটি উচ্চ মন্দির আকৃতির কবর আছে, ইহা মণি বিবির কবর নামে অভিহিত এবং নাবিকদিগের নিকট কুলপী প্যাগোডা নামে পরিচিত। পূর্ব্বে কুলপীর নিকট জাহাজের একটি নঙ্গর ফেলিবার স্থল ছিল। কবরটি একটি ইংরেজ মহিলার কবর বলিয়া কথিত।

লক্ষ্মীকান্তপুর হইতে অনতিদূরে সুন্দরবনের ১১৬ নং লাটে "জটার দেউল" নামে পরিচিত একটি পুরাতন ও ভগ্নপ্রায় দেবমন্দির দৃষ্ট হয়। ইহা ৫০।৬০ হাত উচ্চ হইবে। ইহার আকৃতি ভুবনেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা একটি শিবমন্দির, আবার কাহারও কাহারও মতে ইহা কোন বৌদ্ধ চৈত্য। ইহার নির্ম্মাণকাল জানা যায় নাই। জটার দেউলের নিকটে ১২৭ ও ১২৮ নং লাটে বিরিঞ্চির মন্দির, ভরত রাজার মন্দির ও ভরত গড় নামে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে সুন্দরবন অঞ্চলে ভরত নামে কোন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। (দৌলতপুর দ্রষ্টব্য)।

জটার দেউলের পশ্চিম দিকে ২৬ নং লাটে রায়দীঘি ও কাঞ্চনদীঘি নামে দুইটি পুরাতন ও উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ প্রকাণ্ড দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়।

জটার দেউলের নিকটে প্রাচীন হাতিয়াগড় অবস্থিত ছিল ; বৌদ্ধযুগে এখানে একটি প্রসিদ্ধ বিহার ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বর্ণিত আছে যে ধনপতি সদাগর "হাতো-ঘরে" অম্বুলিঙ্গ শিব ও নীলমাধবের পূজা করিয়াছিলেন। গোড়াই গাজীর প্রসঙ্গে হাতিয়াগড়ের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। (বারাসাত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ের "হাড়োয়াখাল" স্টেশন দ্রষ্টব্য)।

**মগরাহাট**—কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দূর। অনেকগুলি খাল এখানে আসিয়া মিলিত হওয়ায় ইহা একটি বড় ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইয়াছে। চাউলের কারবারের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ।

**বাসুলডাঙ্গা**—কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দূর। স্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণদিকে বোলসিদ্ধি নামক গ্রামে এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছেন। গ্রামের এক প্রান্তে একটি উচ্চ ভূখণ্ডের উপর শিবের মন্দির অবস্থিত। কবে কাহার দ্বারা এই শিবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। স্থানীয় লোকে ইহাকে অনাদিলিঙ্গ বলিয়া মনে করেন। শিবের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষের চিহ্ন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলের দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল। একজন সন্ন্যাসী তথায় বাস করিয়া শিবের অর্চ্চনা করিতেন। সন্ন্যাসী বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন ; তিনি যাহাকে যাহা বলিতেন

তাহাই ফলিত। এই জন্য এই গ্রামের নাম বাক্‌সিদ্ধি বা বোলসিদ্ধি হয়। গাজন ও শিবরাত্রির সময় এই শিবমন্দিরে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

**ডায়মণ্ড হারবার**—কলিকাতা হইতে ৩৭ মাইল দূর। এই স্থানের দেশীয় নাম হাজীপুর। বাণিজ্য জাহাজ সকলের অবস্থানের জন্য এই স্থানটি বিশেষ উপযোগী বলিয়া ইংরাজেরা ইহার ডায়মণ্ড হারবার নামকরণ করেন। একশত বর্ষেরও পূর্ব্বে এই স্থানে বহু জাহাজ আসিয়া থামিত এবং মাল উঠা নামা করিত। ইহা চব্বিশ পরগণা জেলার অন্যতম মহকুমা। এখানে গঙ্গার বিস্তৃতি প্রায় তিন মাইল ও দৃশ্য অতি মনোরম। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু জল থৈ থৈ করিতেছে দেখা যায়; সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের দৃশ্য আরও সুন্দর। এখানে গঙ্গার কিনারা দিয়া একটি বড় বাঁধ আছে, এই বাঁধের উপর দিয়া ভ্রমণ করা বড়ই আনন্দ দায়ক। দক্ষিণ দিক হইতে আগত সমুদ্রের নির্ম্মল বাতাস ক্লান্ত দেহমনকে তৃপ্ত করে। ডায়মণ্ড হারবারের গঙ্গাতীরে একটি সুন্দর



লকগেট ও ঝাউবীথি, ডায়মণ্ডহারবার

ঝাউ বীথি আছে। স্থানটি যেমন নির্জ্জন, তেমনই মনোরম। কলিকাতা শহরের বহু নাগরিক ও ছাত্র এই স্থানে বনভোজন বা চড়িভাতি করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। এখানকার লক্‌গেট বা নদী হইতে খালে জল লইবার দরজা অপর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। স্থানটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর। নদীর তীরে এখানে একটি পরিত্যক্ত দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম চিংড়ীখালি গড়। বহিঃ শত্রুর আক্রমণ হইতে কলিকাতা নগরী রক্ষা করিবার জন্য এই দুর্গটি নিম্মিত হইয়াছিল, পরে ইহা পরিত্যক্ত হয়।

এই স্থানে ইংরেজদের একটি পুরাতন গোরস্থান আছে। কথিত আছে চৈতন্যদেব পুরী গমন কালে হাজীপুরে আসিয়াছিলেন।

**গঙ্গাসাগর**—ডায়মণ্ড হারবার হইতে স্টীমার যোগে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ গঙ্গাসাগর বা সাগরদ্বীপে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যাইতে হয়। ডায়মণ্ড হারবার হইতে গঙ্গাসাগর দ্বীপের দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময়ে এখানে প্রসিদ্ধ মকর স্নানের মেলা হয় এবং উহাতে ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের লোক যোগদান করে। মেলায় সুন্দর রঙীন কাঠের নানারূপ পুতুল ও কাঠের জন্তু জানোয়ার বিক্রীত হয়; বিশেষতঃ সুন্দরবনের বাঘের মূর্ত্তিগুলি খুবই স্বাভাবিক। এগুলি পুরাতন লোক-শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। এই মেলায় যত অধিক সংখ্যক সাধুর সমাগম হয়, বাংলার আর কোন তীর্থে

বা মেলায় সেরূপ হয় না। সাধুদের মধ্যে নাগা সাধুদের সংখ্যাই কিছু অধিক। এই মহাতীর্থে স্নান করিলে লোকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে এবং এখানে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধ তর্পণে অনন্ত ফল লাভ হয় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে গঙ্গাসাগরের কথা আছে।

গঙ্গাসাগর হিন্দুর একটি অতি প্রিয় ও অতি পবিত্র তীর্থ। পবিত্রতায় অন্য কোনও তীর্থ ইহার সমকক্ষ কিনা সন্দেহ। এই সবিশেষ পবিত্রতার প্রধান কারণ ইহা পুণ্যতোয়া গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া। হিন্দুর নিকট গঙ্গা সর্ব্বত্রই পবিত্র এবং পবিত্র নদীর উৎস ও মুখ বা মোহানা অন্য অংশ হইতে পবিত্রতর গণ্য হয় বলিয়া গঙ্গার উৎস গঙ্গোত্রী এবং মোহানা গঙ্গাসাগর গঙ্গার অপরাংশ হইতে অধিকতর পবিত্র। গঙ্গার ন্যায় সাগরও হিন্দুর নিকট সর্ব্বত্রই পবিত্র, সেইজন্য তাহাদের সঙ্গমস্থল গঙ্গাসাগরের পবিত্রতা বহুমাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার উপর সুপ্রসিদ্ধ কপিলমুনি কঠোর তপশ্চর্য্যার পর তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া এই স্থানকে পূত করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে সগরের প্রপৌত্র ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়া এই স্থানেই কপিলমুনির শাপে ভস্মীভূত সগরের যাট হাজার পুত্রকে গঙ্গাবারির মাহাত্ম্যে মুক্তিদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে গঙ্গাসাগর তীর্থের মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত আছে। পুরাণে লিখিত আছে, রামচন্দ্রের ত্রয়োদশ স্থানীয় পিতৃপুরুষ অযোধ্যা-রাজ সগর নিরনব্বই বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার পর শতবার পূর্ণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার যজ্ঞের আয়োজন করেন। ইহাতে স্বর্গরাজ ইন্দ্র, যিনি নিজে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, উদ্বিগ্ন ও ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন, কারণ তাহা হইলে তাঁহার কৃতিত্ব আর থাকিবে না। ইন্দ্র তখন যজ্ঞের জন্য ছাড়িয়া-দেওয়া সগরের অশ্বটি চুরি করিয়া কপিলমুনি যে স্থানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তাহার নীচে মাটির মধ্যে একটি ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন। সগরের যাট হাজার পুত্র নানা দিকে অন্বেষণ করিবার পর অশ্বটিকে পাইয়া মনে করিলেন কপিলমুনিই বুঝি ইহাকে চুরি করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা তাঁহাকে আঘাত করিলে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয়। মুনি চোখ খুলিয়া তাঁহাদের দেখিয়া শাপ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ভস্মীভূত হইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হইলেন। মুনি বিধান দিয়াছিলেন যে ভস্মস্তূপে যদি গঙ্গার ধারা লইয়া আসা যায় তাহা হইলেই শুধু মুক্তি সম্ভব। সগরের প্রপৌত্র ভগীরথ বহু তপস্যার পর গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যে আনিতে সক্ষম হন। কথিত আছে ভগীরথ এইরূপে পথ দেখাইয়া সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী চব্বিশ পরগণা জেলার হাতিয়াগড় পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়া আর পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। সগরপুত্রগণের ভস্মে নিশ্চিতরূপে পৌঁছিবার জন্য গঙ্গা তখন শতভাগে বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হইলেন। এইরূপে গঙ্গার বিভিন্ন মোহানাগুলি ও ব-দ্বীপ সৃষ্ট হইল। একটি ধারা দিয়া সগর পুত্রগণের ভস্মরাশি ধুইয়া লইয়া গঙ্গাদেবী তাঁহাদের আত্মার সদ্গতি করিলেন। গঙ্গাসাগরে গঙ্গাদেবী কপিল, সমুদ্র ও ভগীরথের মূর্ত্তি আছে। যাত্রীরা স্নানান্তে এই মূর্ত্তিগুলি দর্শন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি সাগরদ্বীপে কপিলমুনির একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

"Ancient System of Irrigation in Bengal" নামক পুস্তকে মিশরের সেচ বিভাগের বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়ম উইল্‌কক্‌স্ মহাশয় লিখিয়াছেন যে মধ্য ও

পশ্চিম বাংলার নদীগুলি দেখিলে সুদৃঢ় ধারণা হয় যে পুরাকালে এগুলি গঙ্গা হইতে কাটা কৃত্রিম খাল ছিল; কালক্রমে ইহাদের এক একটি ভাগীরথীর ন্যায় বৃহৎ নদীতে পরিণত হইয়াছে। ভগীরথের উপাখ্যান বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন সম্ভবতঃ ইনিই ছিলেন সেই সুদক্ষ এঞ্জিনিয়র, যাঁহার খনিত কৃত্রিম খালগুলির সাহায্যে বাংলা সুজলা সুফলা হইয়াছিল। হয়ত গঙ্গাসাগরের মেলা সেই ঘটনারই স্মারক হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বে গঙ্গাসাগর তীর্থে যাওয়া বড় কষ্টকর ব্যাপার ছিল। দীর্ঘ দিন ধরিয়া শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য পথে বা বড় বড় নদী দিয়া নৌকায় করিয়া যাতায়াত করিতে হইত। ইহাতে বিপদের আশঙ্কা যে কত ছিল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি দৈব দুর্ব্বিপাক, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ, জলদস্যুর অত্যাচার ও বিসূচিকা প্রভৃতি মহামারীর জন্য তীর্থযাত্রীদের অনেকেই আর ধন প্রাণ লইয়া গৃহে ফিরিতে পারিত না। লোকে সাগর তীর্থে যাইবার পূর্ব্বে আত্মীয় স্বজনগণের নিকট হইতে একরূপ চিরবিদায় লইয়া বাহির হইত। এই কারণেই অতীতে পবিত্র গঙ্গাসাগর হরিদ্বার, কাশী বা প্রয়াগের মত জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে ও রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস" নামক কবিতায় সেকালের গঙ্গাসাগর তীর্থ যাত্রার অতি উজ্বল চিত্র অঙ্কিত আছে। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। অন্যান্য তীর্থের ন্যায় গঙ্গাসাগর তীর্থও এখন অতি সুগম ও ঘরের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত রেল গাড়ীতে আসিয়া তথা হইতে স্টীমারে গেলে আজকাল অতি অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্প ব্যয়ে ভারতের এই অন্যতম প্রধান তীর্থটি দেখিয়া আসিতে পারা যায়। মকর স্নানের মেলা উপলক্ষে রেল গাড়ী ডায়মণ্ড হারবারে একেবারে গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত চালানো হয়, গাড়ী হইতে নামিয়াই যাত্রিগণ সম্মুখে স্টীমারে গিয়া উঠিতে পারেন। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য বাংলা তথা ভারতের প্রধান প্রধান স্থান হইতে এই সময়ে ডায়মণ্ড হারবার হইয়া রেল ও স্টীমার যোগে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত সুলভ মূল্যে একটানা যাতায়াতী টিকিট বিক্রীত হয়। মেলা উপলক্ষে সাগরদ্বীপেও আজকাল অতি সুবন্দোবস্ত হয়। নির্ম্মল পানীয় জল, বহুবিধ খাদ্য ও অন্যান্য বস্তুর দোকান, চালাঘর, পুলিস প্রহরী ও স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা, শৌচাগার, রাত্রিকালে উজ্বল আলোকের ব্যবস্থা ও চিকিৎসা কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া মেলার কয়দিন নির্জ্জন সাগরদ্বীপ একটি ছোটখাট শহরে পরিণত হয়। গঙ্গাসাগর যাতায়াতের পথের দৃশ্যও অতি সুন্দর। দিগন্ত বিস্তৃত সলিল রাশির পরপারে শ্যামায়মান বৃক্ষশ্রেণীর সবুজরেখা তীরভূমির অস্পষ্ট আভাষ জানায়। দেখিলেই "কপালকুণ্ডলার" নবকুমারের ন্যায় মনে পড়িবে রঘুবংশের সেই অমর শ্লোক—

"দূরাদয়শ্চক্রঃ নিভস্য তন্বীঃ
তমাল তালী বনরাজি নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥ "

পূর্ব্বকালে সন্তানহীনা বহু নারী পুত্রলাভেচ্ছায় মানসিক করিয়া প্রথম সন্তানটি গঙ্গাসাগরে অর্ঘ্য দিয়া আসিতেন; তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, ইহার ফলে আরও

সন্তান সন্ততি লাভ করিবেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী আইন করিয়া এই নির্ম্মম ও নিদারুণ প্রথাটি বন্ধ করিয়া দেন।

বর্ত্তমানে সাগরদ্বীপে কয়েক ঘর গৃহস্থ সাধুর বসবাস হইয়াছে। যাহারা সুন্দরবন অঞ্চলে মহাল করিতে অর্থাৎ কাষ্ঠ, মোম ও মধু সংগ্রহ করিতে যায়, সাধারণতঃ তাহাদের দানের উপর নির্ভর করিয়া ইহাদের দিন চলে। এই দ্বীপের উত্তর দিকে পোর্ট কমিশনার-গণের লাইট হাউস ও আবহাওয়া অফিস অবস্থিত। লাল রঙের দ্বিতল অফিসগৃহ ও বাতি ঘরটি বহু দূর হইতে দৃষ্টি পথে পতিত হয়। সাগরদ্বীপের পরিমাণ প্রায় ১৭০ বর্গ মাইল। ইহা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। বর্ত্তমানে ইহা জনহীন অরণ্যের অংশ মাত্র হইলেও একসময়ে এখানে বহুলোক বাস করিত। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে এক ভীষণ জলপ্লাবনের ফলে এই দ্বীপ জনহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হয়। ইংরেজ আমলে ১৮১১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই দ্বীপে পুনরায় বসতি স্থাপনের চেষ্টা চলে, কিন্তু ১৮৩৩ ও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের সাইক্লোনে বহু লোক মারা যায়। দ্বীপের উত্তরভাগে এখন চাষ আবাদ চলিতেছে। যে স্থানে গঙ্গাসাগরের মেলা হয় তাহার সামান্য উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে একটি ভগ্নপ্রায় ইষ্টকালয় আজিও বর্ত্তমান আছে। এই স্থানে হইতে কয়েক মাইল উত্তরে বামুনখালি নামক স্থানে একটি প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয় এবং নিকটবর্ত্তী চন্দনপীড়ি নামক জঙ্গলেও একটি ধ্বংসোন্মুখ মন্দির ও বুড়বুড়ীর তট নামক আবাদে "বিশালাক্ষীর মন্দির" নামে একটি পুরাতন মন্দির আছে।

সাগরদ্বীপে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের একটি দুর্গ ছিল ও একটি নৌ-বহর এখানকার ঘাঁটি রক্ষা করিত। এই ঘাঁটি নিরাপদ করিবার জন্য প্রতাপাদিত্য এই জমি অধিকার করেন। সাগরদ্বীপ হইতে রাজধানী ধূমঘাট পর্য্যন্ত জলপথ জাহাজ দিয়া পাহারা ও রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল; এই কার্য্যে এবং সাগরদ্বীপে জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামতী কার্য্যে প্রতাপাদিত্যের অনেক ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারী নিয়োজিত ছিল। সেই জন্য ধূমঘাট যাইবার জলপথের নাম হইয়াছিল "ফিরিঙ্গী ফাঁড়ী"। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন সাগরদ্বীপেই প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল; রামরাম বসু ও হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রভৃতি প্রতাপাদিত্যের জীবনী লেখকগণ তাঁহাকে সাগরদ্বীপের শেষ রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জেস্যুইট পাদ্রীগণ প্রতাপাদিত্যকে যে চ্যাণ্ডিকানের রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কাহারও কাহারও মতে সেই চ্যাণ্ডিকান বা "চাঁদখাঁ" চক সুন্দরবনের সাগরদ্বীপ অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। (ঈশ্বরীপুর দ্রষ্টব্য)।

গঙ্গাসাগর হইতে ১০।১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার দক্ষিণ প্রান্তে বাহির সমুদ্রের উপর **নারায়ণতলা** দ্বীপ অবস্থিত। নাবিকদিগের নিকট ইহা মেক্‌লেন্‌বার্গ দ্বীপ নামে পরিচিত। উত্তর-দক্ষিণে ইহা নয় মাইল লম্বা এবং প্রস্থে মোটামুটি তিন মাইল। ইহার সাগর সৈকতের উত্তরে বালিয়াড়ি এবং তাহার উত্তরেই বৃক্ষশ্রেণী; স্থানটি সত্যই মনোরম। দ্বীপের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি মিষ্ট জলের ঝিল আছে। স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজর যখন বাংলার ছোট লাট ছিলেন সে সময়ে তিনি কলিকাতা-বাসীদিগের বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এই দ্বীপটিকে একটি স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাস্তা ঘাট, ডাক-বাংলা, ডাক্তারখানা, গল্‌ফের মাঠ প্রভৃতি তৈয়ার

হইয়াছিল ; কিন্তু বায় বাহুল্যের জন্য গবর্ণমেণ্টকে এই পরিকল্পনা বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। সেই সময়ে দ্বীপটির ফ্রেজারগঞ্জ নূতন নামকরণ হয়। রাস্তা ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণকালে অনেকগুলি পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এবং চারটি ইটখোলা দৃষ্ট হয়।

**সুন্দরবন**—বাংলাদেশে সুন্দরবনের মত অরণ্য আর একটিও নাই। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে তরাইয়ের প্রসিদ্ধ জঙ্গলও এত বড় ও এত বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। ২৪ পরগণা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ এই তিনটি জেলার দক্ষিণাংশ জুড়িয়া বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবন দৈর্ঘ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৮০ মাইল ও প্রস্থে স্থানভেদে ৬০ হইতে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সুন্দরবনের পশ্চিমে ভাগীরথী এবং পূর্ব্বে মেঘনা। এই দুই প্রান্তের উচ্চ ভূমি হইতে জমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া মধ্যভাগে খুলনা জেলা এবং ২৪ পরগণার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে নিম্ন জলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

ইছামতী বা যমুনা যশোহর জেলা হইতে খুলনা জেলায় প্রবেশ করিয়া কতকদূর ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলার সীমা নির্দ্দিষ্ট করে ; তাহার পর যমুনার শাখা কালিন্দী এই সীমা রক্ষা করিয়া রায়মঙ্গলের সহিত মিলিত হয়। রায়মঙ্গল দক্ষিণে সমুদ্রে মিলিবার পূর্ব্ব হইতে বিশালরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্রের শাখা বা বাহু রূপেই দৃষ্ট হয়। রায়মঙ্গলের পূর্ব্বদিকে পর পর মালঞ্চ, বড়পাঙ্গা, মর্জাতা, বাংড়া ও হরিণঘাটাও এইরূপ সমুদ্র-বাহু রূপে যেন ডাঙ্গার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। ভাগীরথী এবং রায়মঙ্গল, কালিন্দী—যমুনার মধ্যস্থ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনে চাষ আবাদের জন্য উচ্চ বাঁধ দিয়া লোনা জল বাহিরে রাখিতে হয়। এখানে আবাদের মধ্যে ছোট ছোট অনেক গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। রায়মঙ্গল—কালিন্দী—যমুনা এবং হরিণঘাটা—বলেশ্বর—মধুমতীর মধ্যস্থ খুলনা জেলার অন্তর্গত সুন্দরবনের নিম্নভূমিতে মানুষের বসতি অল্প এবং চাষ আবাদের জন্য নীচু নীচু বাঁধ দেওয়া হয় ; এ অঞ্চলের চাষীরা খুব কমই আবাদের মধ্যে বাস করে। হরিণঘাটা—বলেশ্বর—মধুমতী এবং মেঘনার মধ্যস্থ বাখরগঞ্জ জেলার সুন্দরবনের উচ্চ ভূমিতে চাষের জন্য কোনও বাঁধ দিতে হয় না এবং আবাদে নানাস্থানে লোকের বসতি আছে। গঙ্গা এবং তাহার শাখা প্রশাখাগুলি বহু বৎসর হইতে নিম্নবঙ্গ তথা সুন্দর বনের পশ্চিম অংশ ত্যাগ করিয়া এখন পূর্ব্বাংশেই তাহাদের মিষ্ট জলধারা বিতরণ করিতেছে ; এই জন্য বলেশ্বর বা হরিণঘাটা এবং পূর্ব্বদিকে বাখরগঞ্জ—সুন্দরবনের অন্যান্য নদীগুলির জল বঙ্গোপসাগরের বেশ নিকট পর্য্যন্ত প্রায় সারা বৎসর মিষ্ট থাকে। মধ্যভাগে খুলনা-সুন্দরবনের নদীগুলির জল ক্রমেই লোনা হইয়া ২৪ পরগণা সুন্দর-বনের জল অত্যন্ত লবণাক্ত হইয়াছে।

সুন্দরবনের অসংখ্য খাল, নালা ও নদীর জলপথ কলিকাতা ও পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে যাতায়াতের প্রধান উপায়। সব নদী নালাতেই জোয়ার ভাঁটা খেলিয়া থাকে এবং জোয়ার ও ভাঁটার সাহায্য লইয়া নৌকাগুলিকে চলিতে হয়। বর্ষাকালে প্রধান প্রধান নদী নালাগুলিতে দুইটি বিপরীত মুখী স্রোত বহিতে দেখা যায়। উত্তর হইতে দক্ষিণে বর্ষার জলের স্রোত এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে সমুদ্রের স্রোত বিপরীতদিকে বহিতে থাকে। দক্ষ সন্তরণকারীরাও এই স্রোত বিপর্য্যয়ে বিপন্ন হইয়া থাকেন। নদীর নীচের জল

একদিকে এবং উপরের জল অপরদিকে বহিতে থাকায় কেহ ডুবিয়া গেলে আর উপরে উঠিতে পারে না। সুন্দরবনের নিম্নভূমি জোয়ারের জলে প্লাবিত হইয়া যায়। এই অঞ্চল উত্তরের নদী সমূহের জলধারায় আনীত পলি মাটির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিকযুগে গঠিত হইয়াছে এবং এই গঠন ক্রিয়া আজও চলিতেছে।

সুন্দরবনের অরণ্য মধ্যে সুন্দরী গাছের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক থাকায় ইহার নাম সুন্দরবন হইয়াছে। এক এক স্থানে এই অরণ্য এরূপ দুর্ভেদ্য যে দিনের বেলায়ও তাহার মধ্যে দৃষ্টি চলে না। সুন্দরী গাছের আকার দীর্ঘ, ইহার কাঠ লালবর্ণ ও খুব শক্ত; এই গাছের পাতা খুব ছোট, উহার উপরিভাগ মসৃণ ও নিম্নভাগ ধূসর বর্ণ। সুন্দরী গাছ ছাড়া এই বনে পশুর, বাইন, ধোন্দল, কেওড়া, গরাণ, গেঁয়ো, গর্জ্জন, হেন্তাল, বলা, বনঝাউ ও গাবগাছ প্রভৃতি নানারূপ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া প্রচুর পরিমাণে গোলপাতা ও হোগলা জন্মে। কাহারও কাহারও মতে সুন্দর বনের নাম সুন্দরী গাছ হইতে হয় নাই। কারণ অরণ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে সুন্দরী গাছ বড় দৃষ্ট হয় না; তাঁহাদের মতে সমুদ্র তীরবর্ত্তী বলিয়া সমুদ্র-বন বা সমুন্দর-বন হইতে সুন্দরবন নাম হইয়াছে। /

সুন্দরবনের অরণ্যে নানাপ্রকার হিংস্র প্রাণী বাস করে। উহাদের মধ্যে "রয়াল বেঙ্গল টাইগার" বা সুন্দর বনের "কেঁদো" বা বাঘের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের ন্যায় হিংস্র জন্তু পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ইহারা এত শক্তিশালী যে বড় বড় গরু বা মহিষকে পিঠের উপর ফেলিয়া অবলীলাক্রমে বড় বড় খাল, নালা লাফ দিয়া পার হইয়া ছুটিতে পারে। ইহাদের উচ্চতা ৩ হইতে ৪ ফুট ও লাঙ্গুলসমেত দৈর্ঘ্য ১০ হইতে ১২ ফুট। ইহাদের গাত্র হরিদ্রাবর্ণ, উহার উপর লম্বা লম্বা কালো ডোরা থাকে। সুন্দরবনের বাঘ শিকারের ন্যায় দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক কার্য্য অতি অল্পই আছে। সুন্দরবনে প্রতি বৎসর বহুলোকে বাঘের হাতে প্রাণ হারায়। নৌকার মাঝি বা দাঁড়ীকে বাঘে মারিয়া ফেলিলে সেই স্থানেই তাহার হাল বা দাঁড় উপরদিক করিয়া পুতিয়া একখণ্ড শাদা কাপড়ের নিশান তাহাতে বাঁধিয়া দেওয়া হয়; নিশানের এক কোণে এক মুঠা চাউল বাঁধিয়া রাখা হয়। সুন্দরবনের সর্ব্বত্র নদী-নালার ধারে এই আড়ম্বরহীন স্মারক চিহ্নগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। বাঘের পরই সুন্দরবনের নরখাদক কুমীরের নাম করা যাইতে পারে। ডাঙ্গায় যেরূপ বাঘের উৎপাত, জলে কুমীরের অত্যাচারও ঠিক সেইরূপ। ইহারা নদী নালা সর্ব্বত্র অবস্থান করে এবং সুযোগ পাইলেই মানুষ ও গরু ধরিয়া লইয়া যায়। সুন্দরবনে অসংখ্য বানর ও বন্য বরাহ বাস করে। বন্য বরাহগুলি চার পাঁচ ফুট লম্বা ও প্রায় দুই তিন ফুট উচ্চ হয়। ইহাদের গায়ের রং কালো ও ফিকে লালে মিশানো এবং ঘাড় ও পেটের লোমগুলির গোড়ার দিক কালো ও আগার দিক সাদা। সুন্দরবনে বন্য মহিষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা অত্যন্ত হিংস্র। চলিত কথায় ইহাদিগকে "বয়ার" বলে। হরিণ শিকারের জন্য অনেকেই সুন্দরবনে যাইয়া থাকেন। এখানে নানাজাতীয় হরিণের বাস, তন্মধ্যে ডোরা বা চিতা হরিণ ও কুকুরে হরিণের সংখ্যাই অধিক। কুকুরে হরিণগুলি দেখিতে বড় ছাগলের মত; ইহাদের গায়ের রং লাল। সুন্দরবনে বড় বড় অজগর ও বহু জাতীয় সাপ আছে। এক একটি অজগর

এত বড় যে তাহারা মানুষ বা হরিণকে অক্লেশে গিলিয়া ফেলিতে পারে। সুন্দরবনে বিষধর সর্পের সংখ্যা খুব বেশী। কেউটা, গোখুরা, পাতরাজ, দুধরাজ, মণিরাজ, ধনীরাজ, ভীমরাজ, শঙ্খচূড়, মণিচূড়, নাগরচাঁদ, কানড়, শাঁখামুঠি প্রভৃতি অসংখ্য শ্রেণীর সর্প সুন্দরবনের অধিবাসী। পূর্ব্বে সুন্দরবনের স্থানে স্থানে গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যাইত। বর্ত্তমানে উহারা একরূপ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। সুন্দরবনে মধুমক্ষিকার সংখ্যাও অপর্য্যাপ্ত। প্রতি বৎসর এই অঞ্চল হইতে বহু সহস্র টাকার মধু ও মোম সংগৃহীত হয়। সুন্দরবনবাসী পক্ষীর মধ্যে কুল্যা আকৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহারা সাদা ও কালো এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। চিল, বক ও কঙ্ক বা কাঁকও সুন্দরবনে প্রচুর দৃষ্ট হয়। সুন্দরবনবাসী কাঁকের সহিত নিত্যদৃষ্ট কাকের কোন সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য নাই।

বাঘ ও কুমীরের হাত হইতে রক্ষা পাইবার বিশ্বাসে কাঠুরিয়া বা মাঝিরা সুন্দরবনে যাইবার সময়ে গাজী মোবারক আলি বা মোব্‌রা গাজীর (ঘুটিয়ারী শরীফ দ্রষ্টব্য) চেলা বা বংশীয় বলিয়া পরিচিত ফকিরদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। ইঁহারা মন্ত্রবলে বাঘ, কুমীর প্রভৃতির আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে এই বিশ্বাসের জোরে তাঁহারা দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল জঙ্গলমধ্যে যাইয়া কাজ করিবার সাহস ও বল পান। কাঠুরিয়ারা জঙ্গলে কাঠ কাটিবার সময়ে ফকিরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ফকির একটুখানি জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে একটি বৃত্ত আঁকেন এবং ইহার মধ্যে লতা-পাতা দিয়া পাশাপাশি ছোট ছোট সাতটি ঘর তৈয়ারী করেন। ডানদিক দিয়া আরম্ভ করিয়া প্রথম তিনটি ঘর যথাক্রমে জগবন্ধু, মহাদেব ও মনসাকে উৎসর্গ করা হয়। ইহার পর জঙ্গলের উপদেবী রূপাপরীর জন্য একটি বেদী তৈয়ারী হয়। ইহার পরে চতুর্থ ঘরটিকে দুভাগ করিয়া যথাক্রমে কালী এবং তাঁহার কন্যা কালীমায়াকে উৎসর্গ করা হয়। ইহার পর জঙ্গলের অপর উপদেবী ওড়পরীর জন্য একটি বেদী থাকে। পঞ্চম ঘরটিকে দুভাগ করিয়া কামেশ্বরী ও বুড়ী ঠাকুরাণীকে উৎসর্গ করা হয়। তৎপরে রক্ষাচণ্ডী নামে সিন্দুরলিপ্ত একটি গাছের গুঁড়ি থাকে। তাহার পর ষষ্ঠ ঘরটি দুভাগ করিয়া গাজী সাহেব এবং তাঁহার ভ্রাতা কালুকে এবং পার্শ্ববর্ত্তী সপ্তম ঘরটিকে দুভাগ করিয়া গাজী সাহেবের পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র চাওয়াল পীর ও রাম গাজীকে উৎসর্গ করা হয়। ইহার পর বাস্তুদেবতার পূজার জন্য কলাপাতা রাখা হয়। ঘটে সিন্দুর দিয়া দেবতাদের ছবি আঁকিয়া সম্মুখে রাখা হয় এবং ঘরগুলির উপরে নিশান ঝুলাইয়া চাউল, কলা, নারিকেল, চিনি, মিঠাই ও চিরাগের নৈবেদ্য দিয়া পূজা করা হয়। স্নানান্তে কাঠুরিয়ার দেওয়া একটি ধুতি পরিয়া বাহুতে, হস্তে ও কপালে সিন্দুর মাখিয়া ফকির পূজা করেন। সর্ব্বশেষে বাঘ তাড়াইবার মন্ত্র বলেন। যদি জানা যায় নিকটে কোন বাঘ আছে, বা যদি বাঘের গর্জ্জন শোনা যায় তাহা হইলে বিশেষপ্রকার মন্ত্র পড়িতে হয়। জঙ্গলে প্রবেশ করিতে হইলে লোকে প্রথমে গাজী সাহেবের নাম লইয়া থাকে।

সুন্দরবন পুরাকালে সমতট বা বগড়ী (বা ব্যাঘ্রতটী) রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। য়ুয়ান চোয়াং নামক প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক সমুদ্রকূলবর্ত্তী সমতট রাজ্যে বহু দিগম্বর জৈন, ৩০ টি বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘারাম এবং এক শত হিন্দু মন্দির দেখিয়াছিলেন। এই

বিহারগুলির চিহ্ন আজ আর বিশেষ নাই। কেহ কেহ মনে করেন এগুলি সুন্দরবনের নরম মাটিতে ভূগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সাগরদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি স্থানে এবং খুলনা জেলার স্থানে স্থানে বৌদ্ধযুগের কিছু কিছু চিহ্ন বর্ত্তমান বলিয়া অনুমিত হয়। (লক্ষ্মীকান্তপুর, গঙ্গাসাগর ও ভরত ভায়না দ্রষ্টব্য)। য়ুয়ান চোয়াংএর সমতট দেশে বাসকালে তথাকার রাজপুত্র প্রসিদ্ধ নালন্দা মহাবিহারের মহাস্থবির হইয়াছিলেন। ইনিই সুবিখ্যাত পণ্ডিত শীলভদ্র। মুসলমান আমলে সুন্দরবন ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চল ভাটিপ্রদেশ নামে খ্যাত ছিল।

অনেকের মতে সুন্দরবনে পূর্ব্বে নানাস্থানে মানুষের বসতি ছিল এবং অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নগরী ছিল; মগ ও পর্ত্তুগীজগণের অত্যাচারে এই সকল লোকালয় উঠিয়া যায় এবং সুন্দরবন ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া পড়ে; ইহা ছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলের ভূমির সর্ব্বদা অবনমন হেতুও লোকালয়গুলি চিরস্থায়ী হয় নাই এবং এই কারণেই পূর্ব্ব বসতির চিহ্নগুলির অধিকাংশই আর দৃষ্টি গোচর হয় না।

সুন্দরবনের মাটী খুঁড়িলে মাঝে মাঝে ভূগর্ভে পুরাতন পুষ্করিণী, মন্দির এবং অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়; তাহা ছাড়া কখনও কখনও বৃক্ষশ্রেণী খাড়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে ভূমির অবনমনের স্পষ্ট প্রমাণ মিলে।

এই জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, পূর্ব্বকালে হঠাৎ অবনমনের ফলে সুন্দরবন জনহীন হইয়া যায়। অপর মতে সুন্দরবনে কখনও বিস্তৃত ভাবে মানুষের বসতি হয় নাই, মধ্যে মধ্যে দু একজন সাহসী ব্যক্তি এখানে ওখানে আবাদ করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছেন মাত্র।

সুন্দরবনের জমির অবনমনের ও পুনরুত্থানের কারণ অনেকের মতে এইরূপ।— বঙ্গোপসাগরের পর রায়মঙ্গল ও মালঞ্চ মোহনার দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা এবং খুলনা জেলার কতকাংশের ঠিক নীচেই সমুদ্রের গভীরতা ৫০।৬০ ফুট হইতে হঠাৎ সমুদ্রতীর হইতে ১৫ মাইল দূরে একেবারে ১৭০০।১৮০০ ফুটে পৌঁছিয়াছে। সমুদ্রের এই গভীর অংশকে Swatch of no ground বা অতলতল বলে। ফার্গুসন সাহেবের মতে বঙ্গোপসাগরে পতিত নদীগুলি হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে স্রোত বহিয়া সংঘাতের ফলে ঘূর্ণীর উৎপত্তি হয়, সেজন্য মাটি সেখানে থিতাইয়া জমিতে পারেনা এবং ইহা হইতেই অতলতলের উৎপত্তি। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বঙ্গোপসাগরে মিলিবার সময় নদীগুলি অনেকটা হয় পূর্ব্বদিকে, নয় পশ্চিমদিকে বহিয়া অতলতলের মুখে ধাবিত হয়; এইজন্য সুন্দরবনের দক্ষিণে নদীর মোহানার চরগুলির অগ্রভাগ অতলতলের দিকে মুখ করিয়া আছে। পূর্ব্বদিকের চর পশ্চিমমুখী এবং পশ্চিমদিকের চর পূর্ব্বমুখী। কাহারও কাহারও মতে আবার ভূমিকম্প বা অকস্মাৎ অবনমনের ফলে এই অতলতলের উৎপত্তি। যাহা হউক, সুন্দরবনের ভূমধ্য হইতে অল্প অল্প করিয়া কাদামাটী চুঁইয়া অনবরত দক্ষিণমুখী জলধারার সহিত অতলতলের দিকে চলিতেছে। ভূমধ্যস্থ মৃত্তিকা এইরূপে বাহির হইয়া যাওয়ায় উপরস্থ অরণ্যময় মৃত্তিকাস্তরের ভারে স্থানে স্থানে জমি বসিয়া যায় এবং জলমগ্ন হইয়া যায়। পলিমাটি জমিয়া আবার এই সকল স্থান ভরিয়া উচ্চ হইয়া উঠে।

সুন্দরবনে এইরূপ উঠা নামা নিয়তই চলিতেছে। এই অতলতল না থাকিলে বিরাট নদীগুলি হইতে রাশি রাশি পলি পড়িয়া বাংলার দক্ষিণে বিশাল বিশাল বদ্বীপ সৃষ্ট হইয়া মধ্য ও পশ্চিম বাংলাকে অতি সত্বর ধ্বংসের পথে লইয়া যাইত।

সুন্দরবনের প্রায় সর্ব্বত্র আষাঢ় শ্রাবণ মাসে দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে কামানের শব্দের মত একপ্রকার শব্দ মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা "গৈবী আওয়াজ" নামে পরিচিত। ইংরেজরা ইহাকে "বরিশাল গান" বলেন। চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও যশোহর জেলায় ইহা বাখরগঞ্জের দক্ষিণভাগ হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। এই শব্দের উৎপত্তির কারণ সঠিক নির্ণীত হয় নাই। কাহারও কাহারও মতে বর্ষাকালে জল বৃদ্ধির এবং অতলতলের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ আছে; কিন্তু তাহা হইলে বাখরগঞ্জ অঞ্চলে ইহা দক্ষিণ না হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে এবং চব্বিশ পরগণা ও খুলনায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব না হইয়া দক্ষিণ হইতে শ্রুত হইত। অপর মতে ইহা সমুদ্রতলের বা আরাকান উপকূলের আগ্নেয় গিরি হইতে উদ্ভূত। আবার কেহ বলেন ইহা বায়ু মণ্ডলের বিদ্যুৎ প্রবাহ হইতে উত্থিত। গ্রাম্য প্রবাদ, ইহা লঙ্কাদ্বীপে রাবণের প্রাসাদের সুবিশাল তোরণদ্বার খুলিবার ও বন্ধ করিবার আওয়াজ।



## (গ) কলিকাতা-খুলনা-বাগেরহাট

**দমদম গোরাবাজার**—কলিকাতা হইতে ৭ মাইল দূর। পূর্ব্বে এখানে একটি সেনা-নিবাস ছিল। সেনা নিবাসের পরিত্যক্ত গৃহগুলি এখন বন্দীনিবাসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই স্থানে লর্ড ক্লাইভের পল্লী-ভবন ছিল; এখনও উহা বিদ্যমান আছে। ইহা বাংলাদেশের প্রাচীনতম অট্টালিকাগুলির অন্যতম; প্রথমে কে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই; অনুমিত হয়, ইহা পূর্ব্বে ওলন্দাজ বা পর্ত্তুগীজ কুঠি ছিল। ইহা একটি উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত; দমদমা শব্দের অর্থ উচ্চ ভূমি বা টীলা এবং ইহা হইতেই স্থানটির নাম হইয়াছে দমদম। এই বাটীতে বসিয়াই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী



ক্লাইভ ভবন, দমদম

তারিখে নবাব মীরজাফরের সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এখানকার ভূতপূর্ব্ব আর্টিলারি মেসের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড কামান পড়িয়া আছে। প্রবাদ যে এই কামানের নাকি অলৌকিক শক্তি আছে এবং ইহারই সাহায্যে ইংরেজেরা পলাশীর যুদ্ধ জয় করেন। এখনও অনেকে এই কামানকে তৈল ও সিন্দূর দ্বারা লিপ্ত করে।

দমদম গোরাবাজারে একটি এরোড্রোম বা বিমানপোতের অবতরণ ক্ষেত্র আছে।

এই স্থানের নাম হইতেই "দমদম বুলেট" নামক এক বিশেষ প্রকার "গুলির" নাম হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথম এই স্থানেই ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল।

**বারাসাত জংসন**—কলিকাতা হইতে ১৪ মাইল দূর। ইহা চব্বিশ পরগণা জেলার একটি মহকুমা। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে জেলার সদর ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এই স্থানে বহু ইংরেজ বণিকের বাগান-বাটী ও পল্টনের উচ্চ ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের শিক্ষার জন্য একটি কলেজ ছিল। শেষোক্ত কারণে ইহাকে "বাংলার স্যান্ড্হার্স্ট্" বলা হইত।

বারাসাত হইতে চার মাইল উত্তর পশ্চিমে বারাসাত-বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে অবস্থিত নীলগঞ্জ গ্রামে বাংলার সর্ব্বপ্রথম নীলকুঠি স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে জন্ প্রিন্সেপ এই কুঠির প্রতিষ্ঠা করেন। এই কুঠির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

স্টেশন হইতে চার মাইল উত্তর-পূর্ব্বে মধুমুরলী নামে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে; প্রায় সওয়া তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মধু ও মুরলী নামে দুই বণিক্ ভ্রাতা ইহা খনন করাইয়াছিলেন। ইহার উত্তর-পশ্চিম পাড়ে একটি পুরাতন নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ আছে। পুষ্করিণীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে একটি উচ্চ স্তম্ভ আছে; ইহা কি জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল জানা যায় নাই। পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি অষ্টকোণ উদ্যান-অট্টালিকার



এরোড্রোম, দমদম

ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ল্যাম্বার্ট নামক একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি দিনাজপুরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহাকে দাহ করা হয় এবং তাঁহার দেহভস্ম তাঁহার প্রিয় অট্টালিকার নীচে প্রোথিত করা হয়।

বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত কাজীপাড়ায় পীর একদিল সাহেব নামক একজন পীরের আস্তানা আছে। এখানে পৌষমাসে একটি মেলা হয়। ইহার সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে, যথা ইচ্ছামত ইনি নাকি গরু মহিষ প্রভৃতিকে বাঘ ভালুকে পরিণত করিতে পারিতেন।

বারাসাত ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের চিকণ শিল্প কিছুকাল পূর্ব্বেও প্রসিদ্ধ ছিল; ইউরোপীয়েরা ইহা আগ্রহের সহিত ক্রয় করিতেন এবং ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়াতে ইহা রপ্তানি হইত।

বারাসাত হইতে বারাসাত-বসিরহাট লাইট্ রেলওয়েযোগে বসিরহাট ও হাসনাবাদ প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়।

**মসলন্দপুর**—কলিকাতা হইতে ৩৪ মাইল দূর। এই স্থান হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী চব্বিশ পরগণা জেলার অন্যতম বাণিজ্য-প্রধান স্থান **বাদুড়িয়ায়** যাওয়া যায়। মসলন্দপুর হইতে বাদুড়িয়া পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে ও মোটরবাস যাতায়াত করে। কলিকাতা হইতে বারাসাত-বসিরহাট লাইট্ রেলওয়ে যোগে আড়বালিয়া বা গোপমহল স্টেশন হইতেও বাদুড়িয়া যাওয়া যায়; উভয় স্টেশন হইতেই বাদুড়িয়া প্রায় ৪ মাইল দূর। মসলন্দপুর স্টেশন হইতে বাদুড়িয়ার পথে প্রায় ছয় মাইল দূরে হায়দরপুর গ্রাম তিতুমীরের জন্মস্থান। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিতুমীরের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তিতু অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি কিছুকাল কলিকাতায় পালোয়ানি করেন; পরে নদীয়া জেলার কয়েকজন জমিদারের বৃত্তিভোগী লাঠিয়াল ছিলেন। এই সময়ে একটি দাঙ্গায় লিপ্ত হইয়া তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অতঃপর ৩৯ বৎসর বয়সে তিনি হজ্ করিবার জন্য মক্কায় গমন করেন ও সেখানে ওয়াহাবি ধর্ম্মের প্রচারক সৈয়দ আহম্মদের শিষ্য হন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাগমন করিবার পর তিনি ওয়াহাবি মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং অচিরকাল মধ্যে বহু মুসলমান তাঁহার অনুগামী হন। এই সময়ে মিস্কিন শাহা নামক জনৈক ফকির তাঁহার সহিত যোগদান করেন। যাঁহারা তিতুমীরের প্রচারিত নবধর্ম্ম মত মানিত না, সেই সকল মুসলমান এবং হিন্দুর উপর তাঁহার অনুচরেরা অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় ও গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত তিতুর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তিতুর বহু লোকবল থাকায় এবং তাহাদের অত্যাচার অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার সাহেব কতকগুলি সৈন্য লইয়া জমিদার-দ্বয়ের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হন; কিন্তু তিতুর সহিত যুদ্ধে তাঁহাদের সমবেত শক্তির পরাজয় ঘটে। জয়স্ফীত তিতু নিজেকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং হায়দরপুরের অনতিদূরবর্ত্তী নারিকেলবেড়িয়া নামক গ্রামে এক বাঁশের কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ঢাল, তরোয়াল, লাঠি, বর্শা, বন্দুক প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে থাকেন। তিতুর অত্যাচার দমনের জন্য মোল্লাহাটি নীলকুঠির ডেভিস্ সাহেব লোকজন লইয়া তিতুমীরের দলকে আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনিও পরাজিত হন। গোবরা-গোবিন্দপুরের ভূস্বামী দেবনাথ রায় তিতুমীরের অত্যাচারে উৎপীড়িত বহু ব্যক্তিকে আশ্রয় দেন এবং স্বয়ং তিতুর সেনাদলের সহিত বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে গুরুতর আঘাতের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সব কারণে তিতুমীরের সাহস অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং একে একে বহু গ্রামের উপর তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল অত্যাচার ও অরাজকতার কথা লর্ড বেন্টিঙ্কের কর্ণগোচর হইলে তাঁহার হুকুমে দুইটি কামান, একশত গোরা ও তিনশত সিপাহী একজন কর্ণেলের পরিচালনায় তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। কর্ণেল সাহেবের লোকজনের উপর তিতুমীরের দলবল অলক্ষিতে ইষ্টক প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। তথাপি অকারণ লোকক্ষয় নিবারণের জন্য কর্ণেল সাহেব স্বয়ং বাঁশের কেল্লার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গ্রেপ্তারি পরওয়ানা দেখাইয়া তিতুকে আত্মসমর্পণ করিতে বলেন। দুইবার অনুরোধ সত্ত্বেও যখন কোন ফল হইল না, তখন কর্ণেল সাহেবের হুকুমে